

ভাসানীকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্মরণ চাই



মন্তব্য প্রতিবেদন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কে তিনি, কি তাঁর পরিচয়? কেন তিনি মজলুম জননেতা, আফো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার নির্বাচিত-নিপীড়িত জনমানুষের নেতা? বাংলাদেশের মুকুটহীন সম্রাট? স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা? কেন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক পিতা? কেন তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নেতা? দেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষের কাছে কি এসব প্রশ্নের উত্তর আছে? উত্তর ইয়েস, কিন্তু প্রশ্ন ১৮ কোটি মানুষের সবাই কি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানেন, মওলানা-কে জেনে-জানেন? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৪৯ বছর। আগামী বছর স্বাধীনতার ৫০ বছর (পৃষ্ঠা ২ দেখুন)

মওলানা ভাসানী'র জীবনী

(১৮৮০-১৯৭৬)

পুরো নাম : আবদুল হামিদ খান ভাসানী
জন্ম : ১২ ডিসেম্বর ১৮৮০।
ধানগড়া, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ।
মৃত্যু : ১৭ নভেম্বর ১৯৭৬, ঢাকা, বাংলাদেশ।
অন্যান্য নাম : লাল মওলানা, মওলানা ভাসানী
প্রতিষ্ঠান : আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফারাক্কা লংমার্চ।
দাম্পত্য সঙ্গী : আলোমা খাতুন, হামিদা খানম।
পুরস্কার : স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭)
আবদুল হামিদ খান ভাসানী, (১২ ডিসেম্বর ১৮৮০-১৭ নভেম্বর ১৯৭৬) যিনি (পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা ১৪)

ছবিতে ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু



হক কথা বলে-মওলানা ভাসানীর সাথে বঙ্গবন্ধু'র সম্পর্ক।

আরো ছবি পৃষ্ঠা ১৯

মওলানা ভাসানী শেখ মুজিব সম্পর্ক

হক কথা ডেস্ক

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করার পরও শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অটুট। কিন্তু স্বাধীনতার পর চরমভাবে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা শুরু করেন তিনি। তখনকার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তৎকালীন উপসচিব ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর।
একদিন গণভবনে ঢুকে দেখেন গোয়েন্দা প্রধানের ব্রিফিং শুনছেন বঙ্গবন্ধু। ভাসানী সম্পর্কে ব্রিফ করছিলেন গোয়েন্দা প্রধান, যার মূল কথা- সন্তোষে মিটিংয়ের পর মিটিং করে যাচ্ছেন ভাসানী, মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে লোকজনকে খেপিয়ে দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে (পৃষ্ঠা ৪ দেখুন)



রাষ্ট্রপতি'র বাণী

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :
“মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এক অবিস্মরণীয় নাম। (পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা ৭)



প্রধানমন্ত্রী'র বাণী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী-এর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :
“মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী-এর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
মওলানা ভাসানী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন কাজ করে গেছেন। পাকিস্তানী (পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা ৭)

CLASSIFIED
WORLD

Buy ▾ Rent ▾ Sell ▾ Tools & Advice ▾ What's New ▾ Property Services ▾ Blog ▾ Help ▾

Sign In
My Activity ▾

Post A Property



No more
worried
Now all in
one click

Coming Soon...
classifiedworld.net

BUY

RENT

PG

BUILDER

LOTS

COMMERCIAL

AGENTS

POST AD

Enter Project, Location or Landmark

Property Type ▾

Budget ▾

Search

Our Best Services

* condition apply.



Home Loan



Mortgage



Income Tax



Credit Repair



Legal



Home
Maintained

সম্পাদকীয়

‘প্রফেট অব ভায়েলেন্স’

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা

ডাক নাম চেগা মিয়া। পুরো নাম আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৮৮০, ধানগড়া, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ। আর মৃত্যু ১৭ নভেম্বর ১৯৭৬, ঢাকা, বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। আফ্রো-এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার মজলুম জননেতা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আওয়ামী লীগ। করো কাছে মওলানা, লাল মওলানা, কারো কাছে হুজুর, কারো কাছে আধ্যাত্মিক পীর। সর্বোপরি বাংলাদেশের রাজনৈতিকদের রাজনৈতিক গুস্তাদ। তাঁর আরো বড় পরিচয় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘রাজনৈতিক গুরু’। আবার কারো মতে ‘ভাসানী-মুজিব’ সম্পর্ক ‘পিতা-পুত্রের’। আর বিশ্বখ্যাত ইংরেজী ম্যাগাজিন ‘টাইম’-এর ভাষায় ‘প্রফেট অব ভায়েলেন্স’।

চলতি বছর ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। দীর্ঘ ৯৬ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনের মওলানা ভাসানী দেশ-জাতিকে শুধু দিয়ে গেছেন, নেননি কিছু। আমরা মনে করি সময় এসেছে তাঁকে দেওয়ার। অবশ্য তাঁর এই পাওনা আরো আগেই পাওনা ছিলো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শীর্ষ স্থানীয় বীর পুরুষ। তাঁকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা, স্বাধীন বাংলাদেশ সর্বোপরি আপামর জনতার অধিকার তথা গণতান্ত্রিক সমাজের কথা ভাবা যায়না। আর বাঙালীদের স্বাধীনতায় নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তাঁর দল রাষ্ট্র ক্ষমতায়, সেই দল তাঁর প্রতি যথাযথ সন্মান দেখাবে না, সন্মান জানাবে না তা কি করে হয়! আমরা বিশ্বাস করি দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর নিজ যোগ্যতায় নিজেকে যোগ্য রাষ্ট্র নেতায় পরিণত করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক ভাভার ও সমৃদ্ধ। তিনি সব কিছুই জানেন, নিজ বুদ্ধিতেই বুঝেন এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নেন।

সময় অনেক পেরিয়ে গেছে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’র পানি অনেক গড়িয়ে গেছে। আমরা অনেক ভুল-ত্রুটি করেছি। মানুষ ভুল থেকেই শিক্ষা নেয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়। মওলানা ভাসানীকে নিয়ে দেশ ও প্রবাসে আরো গবেষণা প্রয়োজন। তাঁকে আরো কাছ থেকে চেনা, জানা জরুরী। আর একটি কথা ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতেই চলে। সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মওলানা ভাসানী তাঁর যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, অধিষ্ঠিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সকল ভুল-ত্রুটি, রাগ-ক্ষোভ, মান-আভিমান ভুলে সকল রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে মওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেবেন, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্মরণ করবেন-এটাই সময়ের দাবী।

ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়

উদযাপিত হবে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছরেও স্বাধীনতার সঠিক আর প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়নি। সন্মানিত হননি সন্মান পাওয়ার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতেই যে চারটি নাম সবার আগে স্মরণ হওয়া উচিত তাঁরা হলেন- স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান, স্বাধীনতার প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী (মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী)। এছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর কমান্ডের কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, চার খলিফা হিসেবে খ্যাত তৎকালীন চার ছাত্রনেতা আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আব্দুল কদুস মাখন ও নূর আলম সিদ্দিকী, কাদেরিয়া বাহিনী’র প্রধান আব্দুল কাদের সিদ্দিকী, বাতেন বাহিনী’র প্রধান খন্দকার আব্দুল বাতেন সহ যে যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতায় অবদান রেখেছেন তাঁর সবাইকে দলমতের উর্ধ্বে উঠে স্মরণ করার পাশাপাশি যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া। কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি?

বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে আজ ক’জনই বা মওলানা ভাসানী-কে চেনেন, জানেন? বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাছে তিনি কি পরিচিত? সাম্প্রতিককালে দেশের একটি টিভি চ্যানেলের এক সচিব প্রতিবেদনে জানা যায়, এইচএসসি বা এসএসসি-কে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই জানানো না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, বিজয়

দিবস কবে? একুশে ফেব্রুয়ারী কেন পালন করা হয় ইত্যাদি। জাতির কি দুর্ভাগ্য! অনুসন্ধান করলে এমন তথ্যই পাওয়া যাবে যে, আজকের তরুণ-তরুণীদের অনেকেই হয়তো মওলানা ভাসানীর নাম শুনেনি, তাঁকে চিনেন না! আর মওলানা ভাসানীসহ দেশের জাতীয় নেতাদের স্মরণ করা, নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয় কি? সেই দায়িত্ব কি রাষ্ট্র বা সরকার যথাযথভাবে পালন করছে?

বেশী দুঃ যাওয়ার প্রয়োজন নেই। নতুন প্রজন্মের কথা বাদ-ই দিলাম। আমরা কে না জানি মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ আওয়ামী লীগ কেন, তার প্রতিষ্ঠাতার নাম নেয় না? কেন মওলানার জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করে না? এমন কি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও তো তারা মওলানা ভাসানীকে যথাযথভাবে স্মরণ করেন না? মওলানা ভাসানীর প্রতি এতো দৈন্যতা, কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ কেন? রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর জন্ম-মৃত্যুদিন পালন করতে বাঁধা কোথায়? আজ সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষী আমরা ভুলে যাই সব কিছু। আমাদের এই বিস্মরণই আমাদের বড় শত্রু। আমরা ইতিহাসের পতাকাটির চেহারা বিস্মৃত? কে আমাদের রাজনীতিকে গণমানুষের বলে চিহ্নিত করেছিলেন? গণমানুষের অধিকার কায়মের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কে? সেই সব মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন কে? অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিক্ষার পথ সুগম করেছিলেন কে? সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া যে দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়- এই সত্য কে আমাদের

ভাসানী : রাজনৈতিক ইতিহাসের মহানায়ক

ড. মাহবুব হাসান



তাঁর পাখনায় ছিলো রৌদ্রগন্ধ ঘুম
ছিলো বাতাবি লেবুর ঘ্রাণ
প্রাণবান সেই পুরুষ-হৃদয়ে
লেগেছিলো
খেটে-খাওয়া মানুষের ঘামের
সাহস;
(মওলানা ভাসানী : তোমার
প্রতীক)

কবিতার এ-কটি পঙ্ক্তি যাঁর
চিন্তাসম্রাজ্য ও রাজনৈতিক চরিত্র
আঁকছে, তিনি বাংলাদেশের
একমাত্র ব্যক্তিত্ব মওলানা
আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
তিনি সত্যিকার অর্থেই
খেটে-খাওয়া মানুষের ‘ঘামের
সাহস’ অর্জন করেছিলেন, তা
নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে
না। কারণ, তাঁর রাজনীতিই
ছিলো গণমানুষের জন্য, তাদের
উন্নতি ও কল্যাণ এবং বঞ্চনার
অবসানের মাধ্যমে প্রকৃত
রাজনৈতিক ও মানবিক আকাশ
সৃষ্টি করা। ওই স্বপ্নময়
আকাশের নিচে যারা বাস করে
তাদের মতোই তিনিও এক
সাধারণ পরিবারের মানুষ
ছিলেন।

অবিভক্ত
উপমহাদেশের বাংলা-আসাম
প্রদেশের রাজনৈতিক মানুষটির
জন্ম হয়েছিলো ১৮৮০ সালে,
বর্তমান বাংলাদেশের
সিরাজগঞ্জে। আর তাঁর
রাজনৈতিক উত্থান আসামের
ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চল ‘ভাসান’-এ।
তরুণ মওলানা ওই ভাসান চরের
প্রতিনিধি হিসেবে আসাম
প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য
নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখান
থেকেই তার নামের সাথে
ভাসানী শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়।
এবং আমরা মাত্র একটি শব্দেই
তাকে চিনতে পারি তাহলো
‘ভাসানী’। কেউ কেউ বলেন
‘মওলানা ভাসানী’, পরবর্তীকালে
তার নামের সাথে তাঁর
রাজনৈতিক চরিত্রও যোগ হয়ে
যায়, আর তাহলো ‘লাল
মওলানা’। তিনি রাজনৈতিক
চিন্তায় ছিলেন বিপ্লবী। বলা হয়
চীনাপন্থী বিপ্লবী। আসলে তিনি
মাওবাদী ছিলেন না। কোনো
রাজনৈতিক মতবাদই তাকে
আটকে রাখতে পারেনি। কেবল
‘বিপ্লব’ ও ‘স্বাধীনতা’ এই দুটি
সত্তাই তিনি লালন করেছেন
আমৃত্যু। তাই বিপ্লবের রঙ
হিসেবে রক্তের লালকেই সিঁফল
বা প্রতীক করা হয়েছে। ‘লাল
মওলানা’ বললে তাই
উপমহাদেশের একমাত্র
রাজনীতিকে চিত্রিত করা হয়,
তিনি মওলানা আবদুল হামিদ
খান ভাসানী। আর তাঁর অস্থায়ী

নিবাস হয় টাঙ্গাইলের সন্তোষে,
এক পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির
পাশে, ছোটো ছনে ছাওয়া
দোচালায়।
কিন্তু এটুকুই তো নয়, তিনি যে
মনন-মানসে বিপ্লবী ছিলেন তার
নমুনা তাঁর রাজনৈতিক
জীবনধারার প্রতিটি বাক্যই রয়ে
গেছে। যারা তাকে জানতে চান,
তাদের উচিত তাঁকে পাঠ করা।
কারণ, আজকের বাংলাদেশের
ভূ-রাজনৈতিক স্বাধীনতার তিনিই
ছিলেন উদ্যোক্তা ও নিয়ামক
শক্তি। তাঁর চেয়েও সিনিয়র
শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল
হক কিংবা হোসেন শহীদ
সোহরাওয়ার্দী রাজনৈতিক চিন্তার
ক্ষেত্রে ভাসানীর মতো প্রজ্ঞাসর
চিন্তার পরিচয় দিতে পারেননি।
তিনি আসাম মুসলিম লীগের
সভাপতি ছিলেন। কিন্তু যখন
দেখলেন সেই মুসলিম লীগ
পাকিস্তান অর্জনের পর
‘রাজনৈতিক ভূ-স্বামী’ ও
ধনিকদের কজাগত হয়ে গেছে,
তিনি বেরিয়ে এলেন ওই
রাজনীতি থেকে। এবং তিনি
গড়ে তুললেন আওয়ামী মুসলিম
লীগ ১৯৪৭ সালে, পাকিস্তানের
স্বাধীনতার পর পরই। তিনি
দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
সভাপতি আর টাঙ্গাইলের
জননেতা শামসুল হক প্রতিষ্ঠাতা
সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।
শেখ মুজিব ছিলেন এই কমিটির
প্রথম যুগ্ম সম্পাদক। পরবর্তীতে
১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগেই
তিনি সভাপতি হিসেবেই
দলটিকে অসাম্প্রদায়িক করে
তোলার জন্য নাম থেকে
‘মুসলিম’ শব্দটি হেঁটে দিলেন।
একজন মুসলিম হিসেবে নয়,
তিনি নিজেকে রাজনৈতিক মানুষ
হিসেবে আত্মপরিচয় গড়ে
নিয়েছিলেন। ১৯৫৪-এর
নির্বাচনটি সাধিত হয়েছিলো
‘হক-ভাসানী’র নেতৃত্বাধীন
হিসেবে। সেই নির্বাচনে
প্রাদেশিক পরিষদে বিজয়ী হয়ে
সরকার গঠন করেছিলো
আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব এই
বিজয়ের পথ ধরেই রাজনৈতিক
ইতিহাসে প্রবেশ করেন।
পাকিস্তানী তথা পশ্চিম পাকিস্তানী
রাজনৈতিক ভূ-স্বামী’দের
সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক গ্রাসের অনু
থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি
১৯৪৯ সালেই বলেছিলেন
বাংলার স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তি
নেই। ১৯৫৮ সালে তাই তিনি
পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের
উদ্দেশ্যে ‘আস-সালামুআলাইম’
বলে বিদায় জানিয়েছিলেন।
১৯৭০ সালে সামরিক সরকারের

অধীনে নির্বাচন তিনি এবং তাঁর
দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেন,
সামরিক সরকারের
ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচনে
তিনি অংশ নেবেন না। এবং
তিনি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ
মুজিবকেও নির্বাচন থেকে বিরত
থাকতে আহ্বান জানান। তিনি
বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী হলেও
সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর
করবে না। ফ্রেমওয়ার্কের একটি
ধারা ছিলো এই যে, সামরিক
সরকার যদি মনে করে ক্ষমতা
হস্তান্তর করবে না, তাহলে তাই
হবে। তার মানে তাদের ইচ্ছার
ওপরই নির্ভর করে বিজয়ী
দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া বা
না-দেয়া। এবং ইতিহাস সাক্ষী,
১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে
ভূমিধস বিজয়ের পরও
ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার শেখ
মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের
চেয়ে গণহত্যা করে জনগণের
রায়কে উল্টে দিতে তৎপর
হয়েছিলো। গোটা ষাটের দশক
জুড়ে বাংলাদেশে যে গণজোয়ার
ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঝড়
উঠেছিলো, তার সিংহাসনে
ছিলেন মওলানা ভাসানী। ৬৬
সালে শেখ মুজিব ৬ দফা
উত্থাপনের পর পাকিস্তানী
আইয়ুব শাহী তাকে কারা বন্দী
করেন। তার মুক্তির প্রথম
আওয়াজ তোলেন মওলানা
ভাসানী। গড়ে তোলেন উত্তাল
গণজোয়ার। তার সাথে যোগ
দেয় ছাত্র সংগঠনগুলো। ৬৯-এর
ছাত্রজনতার
গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে
মুক্তি পান শেখ মুজিব। এবং
তিনি পাকিস্তানী শাসকদের
প্ররোচনায় বিশ্বাস করে নির্বাচনে
অংশ নেবার ঘোষণা দেন।
মওলানার নিষেধ তিনি
মানেননি। তিনি ভেবেছিলেন
জনগণের রায় সামরিক সরকার
মেনে নেবেন। কিন্তু দূরদর্শী
মওলানা বুঝেছিলেন পাকিস্তানী
শাসকেরা মেনে নেবে না।
সেটাই সত্য হয়েছিলো।
স্বাধীনতার পরও তিনি
গণমানুষের পক্ষে তার রাজনীতি
জারি রেখেছিলেন। শেখ মুজিব
সরকারের সমালোচনাই কেবল
করেননি তিনি, তিনি অনেক
ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনাও
দিয়েছেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ,
অশীতিপূর রাজনীতিকের প্রতি
সন্মান জানাননি শেখ মুজিব।
অথচ শেখ মুজিব ছিলেন
ভাসানীর আর্শিবাদপুষ্ট এক তরুণ
রাজনীতিক। তাকে নানা পর্যায়ে
রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত

করেছিলেন মওলানা। ব্যক্তিগত
পর্যায়ে শেখ মুজিব মওলানা
ভাসানীকে ‘পিতার মতোই শ্রদ্ধা’
করতেন, কিন্তু নিজের ত্রুটিগুলো
থেকে বেরিয়ে আসতে
পারেননি।
‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক
পিতৃত্ব’ দাবি করার জন্য যদি
কাউকে মনোনয়ন দেয়া হয়,
তাহলে তিনি মওলানা আবদুল
হামিদ খান ভাসানী। কারণ তিনি
কেবল স্বাধীনতা শব্দটিকে
মনেপ্রাণে লালনই করেননি, তা
রাজনৈতিক বিশ্বাসের সোপান
করে তুলেছিলেন। বন্দুকের নল
ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন
সম্ভব নয়। তিনি সেই লক্ষ্যেই
রাজনীতি জারি রেখেছিলেন
আমৃত্যু। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর
দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা
সেই সত্যই প্রমাণ করেছে।
আমরা ৩০ লাখ মানুষের রক্ত
আর অগণন মা-বোনের
ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জন করেছি
কাম্বিত স্বাধীনতা। নির্বাচনের
ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন
সম্ভব নয়। তা ক্ষমতায় যাওয়ার
সিঁড়িমাাত্র। পাকিস্তানী সামরিক
শাসকেরা সেই সিঁড়িও গুড়িয়ে
দিয়েছিলো।

মওলানা ভাসানী ভারতের
ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে যে
রাজনৈতিক মিছিল করেছিলেন
১৯৭৬ সালে, তাও ছিলো
আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে,
স্বাধীনতার পক্ষে আরেক
রাজনৈতিক ইতিহাস। তিনি
ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো
রাজনৈতিক চরিত্র নেই যাকে
জাতির বিবেক, জাতির পিতার
ভূমিকায় অভিসিক্ত করতে
পারে। তিনি যে ‘জাতির
জনকেরও জনক এবং গুরু’ এটা
আজ আমরা ভুলে বসে আছি।
আজ তাকে আমরা স্মরণ করি
না। এই ব্যর্থতা কিন্তু তার নয়।
আমাদের অশিক্ষা, কুশিক্ষা,
অজ্ঞানতা, ইতিহাস বিমুখতা,
গাঙ্ড়লে গা ভাসানো, অন্যের
জিহবায় ঝাল ও নুন পরখের
অভ্যাসেরই কুফল এটা। আমরা
চাই রাজনৈতিক নেতাদের
প্রতিটি পদক্ষেপের অনুপুঙ্খ
বিচার-বিশ্লেষণ হোক।
তাহলেই কেবল ‘অবদান’ কার
তা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু
আজকের বাংলাদেশে তরুণ
প্রজন্ম জানেন না যে রাজনৈতিক
ইতিহাসের প্রকৃত জ্যোতিষ্ক কে
ছিলেন।
কারণ তাঁর নামটিও আজকে
উচ্চারণ করতে চায় না এবং
জানেও না তিনি কে এবং কি
ছিলেন।

শিথিয়েছিলেন? ১৯৭১ সালে বৃদ্ধ
বয়েসেও তিনি মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে
পড়েছিলেন স্বাধীনতার জন্য, আজকে
তিনি জাতির নতুন প্রজন্মের কাছে প্রায়
অচেনা, অজানা মানুষ।
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর
রাজনৈতিক উত্থান আসামের ব্রহ্মপুত্র
নদের ভাসান চর থেকে, ব্রিটিশ
ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে
শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের জাগিয়ে
তোলার আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই
তরুণ মওলানা সেখানকার মানুষদের
প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক
পরিষদে শোষণ আর নির্যাতনের
বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।
রাজনৈতিকভাবে সেখানকার
কৃষক-মজুর আর সর্বস্তরের
মন্ত্র দিয়েছিলেন। এ-কারণে ব্রিটিশ

ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে আসাম
থেকে বহিস্কার করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার
পর তিনি ঢাকায় এসেই মুসলিম লীগ
ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করেন আওয়ামী
মুসলিম লীগ, ১৯৪৭ সালে। তাঁরই
নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে
‘যুক্তফ্রন্ট’ গড়েন একে ফজলুল হকের
রাজনৈতিক দলের সাথে।
১৯৫৮ সালে তিনি মতবিরোধের কারণে
নিজের হাতে গড়ে তোলা দল ত্যাগ করে
চলে যান এবং নতুন দল গড়ে নেন।
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গড়ে
তিনি ষাটের দশকে, আইয়ুব শাহীর
রাজনৈতিক ভিত কাঁপিয়ে দেন। ৬
দফার কারণে তারই ‘রাজনৈতিক শিষ্য’
শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলে
তারই নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাজনৈতিক
মোর্চার এক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে
ত্রিপুর রাজনৈতিক প্রতিবাদী আন্দোলন

সৃষ্টি করেন। সাথে যোগ দেয় তখনকার
ছাত্র-জনতা আর রাজনীতিকরা, ১১ দফা
দাবি আদায়ের লক্ষ্যে।
শেখ মুজিব মুক্তি পান এবং তিনি
পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সরকারের
টোপ গিলে সামরিক ৪ দফা
ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচনে অংশ
নেন।
এই রাজনৈতিক উত্থানের গোটাটাই
‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক গুরু’ মওলানা
ভাসানীর অবদান। তাঁর লক্ষ্য ও
আদর্শের পক্ষেই সাধারণ মানুষ
প্রতিবাদ-প্রতিরোধের দুর্গে পরিণত করে
দেশকে। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন
সবচেয়ে অটল ব্যক্তিত্ব।
আজ সেই অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক
মহানায়ককে বিস্মৃত হয়েছে সরকার।
বিস্মরণের এই রাজনীতি যে তাদেরকেও
কালের গর্ভে আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত করবে

তাতে কোনো ভুল নেই।
সময়ে দাবী আজ জাতির নবপ্রজন্মের
কাছে তুলে ধরতে হবে মওলানা আবদুল
হামিদ খান ভাসানীকে। তার রাজনৈতিক
অবদান স্মরণ করে তা জানতে হবে
নবাগত মানুষদের, যারা আমাদের জাতি
বিনির্মাণের শক্তি। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে
স্মরণ করার আয়োজন হোক আজ
থেকেই। তাঁর মৃত্যুদিনটিকে জাতির
রাজনীতিকদের স্মরণদিন হিসেবে
ঘোষণা করা হোক।
আওয়ামী লীগের তো উচিত তাদের
দলের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী
জন্মদিন ও মৃত্যুদিন পালন করা।
দেশের ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকদেরও
উচিত মওলানা ভাসানীকে স্মরণ করা।
কারণ তিনিই বহুদলীয় রাজনীতির এবং
গণমানুষের অধিকার কায়মের
রাজনৈতিক দরোজার নির্মাতা।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
'নদী চর খাল বিল গজারীর বন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন'

মওলানা ভাসানী



লও লও লও সালাম

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল জেলাবাসী যাকে নিয়ে গর্বিত সেই

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই গভীর শ্রদ্ধা

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের পক্ষে



আব্দুল হাকিম

সভাপতি



আতিকুর রহমান আনিম

সাধারণ সম্পাদক



আব্দুর রব

কোষাধ্যক্ষ

❖ সহ সভাপতি- খন্দকার জাকির হোসেন বাদল, মো: তৌফিকুর রহমান ও কবির বোখারী ❖ সহ সাধারণ সম্পাদক- মো: ছানোয়ার হোসেন ও নাছরিন চৌধুরী ❖ সাংগঠনিক সম্পাদক-মো: শামীম মিয়ান ❖ মহিলা সম্পাদিকা- মলি ❖ প্রচার সম্পাদক- মো: আলম ❖ সাহিত্য সম্পাদক- মো: মোর্শেদ ❖ ধর্ম সম্পাদক- মো: মোমেন ❖ ক্রীড়া সম্পাদক- মো: এনামুল হাসান ❖ দপ্তর সম্পাদক- মো: তুষার ❖ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মো: মাসুদ রানা ❖ কার্যকরী সদস্য : খন্দকার বদরুজ্জামান পিকলু, মো: মোজাম্মেল হক, মো: আকতারুজ্জামান, মো: ফরিদুল ইসলাম খান, মো: শরিফ শিকদার, শাহিনুর রহমান, ইসমাইল হোসেন ও মো: শহিদুল ইসলাম।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক

লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, টুপি



মাহমুদ রেজা চৌধুরী

অনেক ক্ষেত্রে মানুষের পোশাকে তার ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেণী চরিত্র কে বোঝা সহজ হয়। আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের এটাই সাধারণ পোশাক। এই পোশাকে কি বোঝা যায়। বোঝা যায় মানুষটি অত্যন্ত সাদাসিধে স্বভাবের, অল্প চাহিদার। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সাথে এই পোশাকের মানুষটি খুব সহজেই মিশে যেতে পারে। মিশে যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বা এভাবেও বলা যায় ব্রিটিশ ভারতের অনেক নেতা এবং নেত্রীকে আমরা দেখছি। নানা পোশাকে, নানা স্বভাবের। পোশাকের সাথে মানুষের স্বভাবের ও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম নেতা গান্ধীর পোশাক ছিল একেবারেই সাধারণ। গান্ধীর চরিত্রের একটা বিশেষ দিকে ছিল তার সেই পোশাক। তার পোশাকের সাথে তার স্বভাব চরিত্রের অমিল ছিল না বলেই, গান্ধীর সেই পোশাক বিশ্ববাসীর কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিলো বলা যায়।

পাক-ভারত উপমহাদেশের আরেক নেতা জিন্মা সাহেব। তারও পোশাকের সাথে তার চরিত্রের মিল ছিল বটে। নেহেরুর পোশাকের সাথে নেহেরুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। নেহেরুর পোশাক ছিল পাঞ্জামা, শেরওয়ানি, মাথায় টুপি। নেহেরুর পোশাক খুব সহজেই প্রমাণ করতো ভারতের উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক ধরনের রাজনৈতিক চরিত্রকেও।

জিন্মা সাহেবের পোশাকে আবার আরেকরকম বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। সেটাকে একটু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায় তার পোশাকের সাথে ভারতবর্ষের মানুষের পোশাকের মিল ছিলোনা বলা-ই যায়। স্যুটেড-বুটেড জিন্মা সাহেবের রাজনীতিটাও ছিল সাধারণ মানুষের শ্রেণীচরিত্র থেকে একটু ভিন্ন, স্বদেশের চাইতে বিদেশ প্রীতি বেশি। ভারতবর্ষে যেন অন্যরকম এক গ্রহ।

আজকে যে মহান নেতার কথা সংক্ষেপে কিছু লিখতে চেষ্টা করব তার নাম, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ইংরেজি ১৮৮৫ সালে এই মহান নেতা জন্মগ্রহণ করেন একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। ভাসানী সাহেবের রাজনীতিটাও ছিল বিশুর মজলুম বলতে বঞ্চিত মানুষের জন্য। যদি একটু লক্ষ্য করি তার পোশাকের দিকে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, আর মাথায় টুপি।

এই পোশাকে কিন্তু বাংলার কোন অথবা ভারতবর্ষের উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত মানুষদের দেখিনা। তারপরে সেই মানুষটি যদি একজন বিশেষ মানুষ হন, নেতৃস্থানীয় কেউ হন। সাধারণ ক্ষেত্রে পোশাক ‘বদলে’ যায়। যেমন গিয়েছিল গান্ধীর।

আমাদের ইতিহাসের অন্যতম স্বপ্নদর্শী বলবো সেই মাওলানা ভাসানী নিজের কোন জাগতিক স্বার্থে তার পোশাক পরিবর্তন করেননি। বিষয়টা ভেবে দেখার বিষয় আছে কিন্তু। মলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কে নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। অনেক ইতিহাস আছে। মাওলানা ভাসানীর সাথে যারা রাজনীতি করেছেন, তাকে কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই এখনো জীবিত আছেন দেশে-বিদেশে। তাই মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে নতুন করে কিছু লেখার তেমন সুযোগ নেই।

মাওলানা ভাসানী তার সারা জীবনের রাজনীতিতে মজলুম মানুষের জন্য সাহসী কণ্ঠ ছিলেন, দিকনির্দেশক ছিলেন। কোন অন্যায়ের সাথে এই মহান নেতা কখনো আপস করেছেন কিনা, সেটা ইতিহাসবিদদের বলবার বিষয়।

মাওলানা ভাসানীকে দেখেছি তৎকালীন পাকিস্তানের সামন্তবাদী রাজনীতির বিপক্ষে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে। মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে। অনেক ইতিহাসবিদরা বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা মাওলানা ভাসানী সবার আগে দাবি তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত করে আনার আন্দোলনেও মাওলানা ভাসানীর কোন বিকল্প ছিলনা তখন।

মাওলানা ভাসানী, বাংলাদেশের ‘স্বপ্নদর্শী’। কথাটা ইতিহাসবিদরা কখনো খাটো করে দেখবেন না বলেই মনে হয়।

মানুষের ভাষায় কথা বলতেন, যে ভাষা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত অসংখ্য মানুষ, বাংলার বঞ্চিত মানুষের। সহজভাবে বুঝতে পারতেন এই মহান নেতার কথা সাধারণ সব মানুষ।

পল্টন ময়দানে একরকম কথা, কিংবা তার বক্তৃতায় একরকম নির্দেশনা। ব্যক্তিগত জীবনে আরেকরকম যাপিত জীবন। তা ছিলনা মাওলানার। টাঙ্গাইলে যে বাড়িতে মাওলানা থাকতেন, (এখন আছে কিনা জানিনা।) সৌভাগ্য হয়েছিল সেই বাড়িটি দেখবার। একেবারে সাধারণ বাড়ি। মাটি ও বেড়ার বাড়ি। একটি কাঠের খাট, মলিন একটি তোষক।

এটা ছিল মাওলানার আমরা যাকে বলি বেডরুম।

মাওলানা ভাসানী কে সত্যি স্মরণ করতে হলে, তার জন্য কিংবা মৃত্যু দিবসে কিছু আলোচনা, কিছু খিচুড়ি বিলানো, খিচুড়ি খাওয়া। এটা মনে হয় মাওলানা ভাসানীকে তার যোগ্য সন্মান দেয়া হয় না। এটা কেবলই কিছু আনুষ্ঠানিকতা। ভাসানী তো কখনও সেই অর্থে ‘আনুষ্ঠানিক’ কোনো ‘ব্যক্তি’ ছিলেন না। ভাসানী ছিলেন মজলুম মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর স্বপ্নপুরুষ।

আজকের বাংলাদেশ এই মাপের কোনো নেতা নেই আর। যেকোনো সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ‘খামোশ’ বলবার কেউ নেই আর।

তবে খামোশ বলবার লোক আছে কিন্তু। তারা খামোশ বলেন যতরকম অনিয়ম, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় সমাজে বাড়ছে। সেসবের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে, তাকে খামোশ বলা হয়। প্রয়োজনে মুক্তিকার সাথে তাকে মিশিয়ে দেয়া হয়। যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ‘খামোশ’ না বলতে পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথাওয়ালা ক্ষমতাসীনদের বিপক্ষে।

আরেকটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটা হল এই মজলুম জননেতার মৃত্যুর পরপরই তার রাজনৈতিক দর্শন, সমর্থক এবং অনুসারীরা অনেক ক্ষেত্রেই রাতারাতি পাশ্টে যায়। যারা মাওলানা ভাসানীর খুব কাছের ছিলেন তারাও আর মৌলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শ এবং রাজনৈতিক চিন্তাকে ধরে রাখতে পারেননি। কিন্তু কেন পারেননি? প্রশ্নটিই যে কারো মনে আসতেই পারে।

আমরা যদি একটু গভীরে বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়গুলি লক্ষ্য করি তখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাবো যে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ধরনের ব্যক্তি আধিপত্যবাদ এবং দলীয় আধিপত্যবাদের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। এই শুরু করার কারণ হলো, দেশের বা সমাজের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করা। সেই দেখাটা কি ?

সেই দেখাটা হল স্বাধীনতা যেন এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা। ব্যক্তির ভেতরে যেমন, দলের ভেতরে তেমন। স্বাধীনতা-পূর্ব সময় আমাদের সমাজ চিন্তা এবং সমাজ দর্শনের যেটুকু ইনক্লুসিভ দর্শন কাজ করতো রাতারাতি পরিবর্তন ঘটে একক্লুসিভ চিন্তার মধ্য দিয়ে।

এটার বড় কারণ পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রতি এবং বস্তুকেন্দ্রিক চাওয়া পাওয়ার মধ্যে আমরা স্বাধীনতাকে বা স্বাধীনতার ফল কে ভোগ এবং উপভোগ করতে হঠাৎ করেই এক ধরনের প্রতিযোগিতাতেই লিপ্ত হয়ে পড়ি। এই প্রতিযোগিতাতে রাজনৈতিক দলগুলি সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দেয়া শুরু করে নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে। তখন অজান্তেই প্রভাবশালী শ্রেণীর মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়। সেই চুক্তিতে হচ্ছে রুটি হালুয়া ভাগাভাগি করে খাওয়ার মত। এখানে একটা জিনিস আমাদের বোঝার ব্যাপার আছে যা



আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের দাসত্বের এবং ক্ষেত্রবিশেষে মনিব চরিত্র সমাজে বহুদিন থেকেই সামন্তবাদী সমাজের এক ধরনের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অন্তরালে বেড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাথে একটু পার্থক্য আছে জনগণের গণতন্ত্রের মধ্যে।

স্বাধীনতার পর পর আমাদের মধ্যে ত্যাগের চাইতে ভোগের স্পৃহা এবং লালসা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্য থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয় একটু একটু করে। ১৯৭৫ এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সামাজিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝতে পারব স্বাধীনতার পরপরই আমরা কিভাবে সমাজের নেয় এবং নৈতিকতা বোধ থেকে সরে গিয়েছিলাম কেবলমাত্র শ্রেণি স্বার্থের কারণে। এই শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর। কিন্তু মাওলানা ভাসানীর জীবিতকালে-ই মূলত মৌলানার রাজনীতির দর্শন একটু একটু করে বিলীন হওয়া শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে তখন পেটি বুর্জোয়া রাজনীতির এক ধরনের প্রভাবের কারণে। কে আমাদের শত্রু, কে আমাদের মিত্র। উভয়ের চেহারা যখন অভিন্ন হওয়া শুরু করল, তখন থেকেই মজলুম মানুষের কণ্ঠস্বর মাওলানা ভাসানীর কণ্ঠস্বর দুর্বল হতে শুরু করল তার শারীরিক এবং বয়সের কারণেও। এই-সব অনেকটা কারণ বলা যেতে পারে যে, মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর ভাসানীর রাজনীতি এবং সমাজে মজলুম মানুষদের আর বন্ধু রইল না। বন্ধুর সাথে বন্ধুর পোশাক মিলল না আর। লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, টুপি, সরিয়ে রাজনীতির পোশাক বদলে গেল সাফারি সুট, তারপর পুরোদস্তুর স্যুটেড-বুটেড। এসবও বলে দেয় রাজনীতির সামাজিক চরিত্র টুপি, পাঞ্জাবী, লুঙ্গির সাথে সাফারি সুটের পরিবর্তনে রাজনীতিও যে বদলে গিয়েছিল।

মাওলানা ভাসানী তাঁর রাজনীতিতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ মাওলানা জানতেন, প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন পরিবার সম্পদ উৎপাদন করতো নিজেদের ভোগের স্বার্থে। যেমন, একটি কৃষক পরিবার যে ধান উৎপাদন করে সেই পরিবার নিজের ঘরেই সেটা ভাঙ্গিয়ে চাল তৈরি করত নিজের খাদ্য সংস্থানের জন্য। ওই চালের বিনিময় কৃষক তার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র জোগাড় করে নিতো।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো বাজার তৈরি করা। বাজারমুখী সংস্কৃতি পুঁজিবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজে এই বাজার মুখি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিলেন মাওলানা ভাসানী। তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুঁজিবাজারের একটি কেন্দ্রে ছিল, উৎস ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ। সেই সম্পদ লুট করে নিত পাকিস্তানী শাসক শ্রেণী এবং আধা পুঁজিবাদী চরিত্রের বণিক শ্রেণি। সেই পাকিস্তানের পুঁজিবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে থাকতেন, বিরুদ্ধে ছিলেন মলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। মাওলানা ভাসানী জানতেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্য বা বস্তু সমূহ পণ্যে (পেডসসডফর) রূপান্তরিত হয়। বাজারে বিক্রয় যোগ্য বস্তুকে আমরা সাধারণত পণ্য বলে থাকি। পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য হলো লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া। এর সাথে আরেকটি বিষয় জড়িত সেটা হল, পুঁজিতন্ত্র উৎপন্ন বস্তুই শুধু পণ্য নয়, মানুষের শ্রম ও ক্ষমতাও পণ্য। এসবও বিক্রি হয় নানাভাবে, মানসিকভাবে শারীরিকভাবে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে শ্রেণী বৈষম্যের নানা উপায়ে।

মাওলানা ভাসানী জানতেন এবং বুঝতেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতি এবং তার ম্যানেজারেরা অথবা শিল্প পরিচালকমন্ডলী উৎপাদন ব্যবস্থাকে আপদমস্তক নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ শুধু এই নয় যে, শ্রমিকদের কত মজুরি দেওয়া হবে বা তাদের কাজ কর্মের গতি প্রকৃতি কি হবে তা নির্ধারণ করা। এই নিয়ন্ত্রণ এর অর্থ এটাও যে কী পদ্ধতিতে উৎপাদন হবে বা কোন লাভ জনক পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং সাথে তার বিপণন সংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ দখলে রাখা। পুঁজি কিংবা অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনার মালিক পুঁজিপতি। ইতিহাস থেকে আমরা এটাও জানি যে, উনিশ শতকের অবাধ বাণিজ্য যুগ থেকে সরে এসে একচেটিয়া পুঁজি, লগ্নি পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের স্তরের বিকাশ ঘটেছে বিশ শতকের প্রারম্ভে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পুঁজিবাদের আরো পরিপক্ব রূপ প্রকাশ পায় বহুজাতিক কর্পোরেশন (Multinational Corporation) এর উদ্যোগে গঠিত আধুনিক পুঁজিবাদে। এই আধুনিক পুঁজিবাদের সামাজিক সংকট, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি যুক্ত ব্যবস্থাপনা, শাসকশ্রেণীর

বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করা। এবং সমাজকে নানা ভাবে বিভক্ত করে সমাজে এক ধরনের এলিট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর জীবন ছিল বিরতিহীন সংগ্রামের। আজকের বিশ্বের চারিদিকে যদি আমরা একবার দৃষ্টি রাখি দেখতে পাই অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের বিকাশ, সামাজিক এলিট তত্ত্ব কিভাবে যে সমাজে মজলুমের ঘনত্ব বানাচ্ছে, সংখ্যা বাড়ছে। রাষ্ট্রে বৈষম্য বাড়ছে। এসবের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে। তেমন ব্যক্তিত্ব, তেমন কণ্ঠ, তেমন চরিত্র, আর সেই লুঙ্গি, পাঞ্জাবি আর বেতের টুপির নেতা কই!

সমাধান কোন পথে। সমাধান ইতিহাসের ইতিবাচক এতিহ্যকে, ইতিহাসের গৌরবকে, ইতিহাসের সন্মানিত ত্যাগী মানুষদের মনে করে যদি নিজেদের চরিত্র কে একটু পাশ্টাতে পারি কোটি, কোটি সাধারণ মানুষদের পক্ষে। তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করতে যদি একবার বলতে পারি অন্যায়কে ‘খামোশ’। মাওলানা ভাসানীর জন্য হোক কিংবা মৃত্যুদিনে তাঁর স্মরণে আমাদের এই চেতনায় নাড়া পড়ুক।

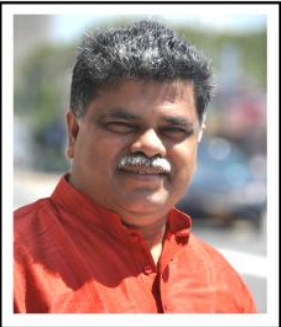
মাওলানা ভাসানী শেখ

মুজিব

সরকারবিরোধী চরম কিছু করার জন্য তৎপর। এখন করণীয় কী? গ্রেপ্তার, না গৃহবন্দী? মন দিয়ে সব শুনলেন বঙ্গবন্ধু। তারপর হঠাৎ এক কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সিলেটের কমলা উঠেছে কি না। কর্মকর্তা জানালেন, উঠেছে। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন, ‘সন্তোষে হুজুরকে [ভাসানীকে বরাবর এই সম্মোহনই করতেন বঙ্গবন্ধু] এক ঝুড়ি কমলা পাঠিয়ে দাও।’ নির্দেশ নিয়ে কর্মকর্তা চলে যাচ্ছেন, ফের তাঁকে ডেকে ঢাকার বিখ্যাত একটি দোকানের নাম উল্লেখ করে বললেন, ‘কয়েক পাতিল মিষ্টিও পাঠিও।’ তখনো নির্দেশের অপেক্ষায় গোয়েন্দাপ্রধান। বঙ্গবন্ধু পাইপ ঠুকে তামাক বের করছেন। শেষে আর থাকতে না পেরে গোয়েন্দাপ্রধান জানতে চাইলেন, ‘স্যার, আপনার নির্দেশ কী?’ বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘নির্দেশ তো দিলাম। বুঝলো না?’ মাথা নাড়লেন গোয়েন্দাপ্রধান। ‘শোনো,’ বললেন বঙ্গবন্ধু, ‘মাওলানা ভাসানীকে গ্রেপ্তার করার জন্য শেখ মুজিব বাংলাদেশ করে নাই।’

স্মরণ : মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

একদিনের দেখা যেনো শত বছরের চেনা



সালাহউদ্দিন আহমেদ

মওলানা ভাসানী। পুরো নাম আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ডাক নাম চেগা মিয়া। দেশব্যাপী খ্যাতি মওলানা ভাসানী নামে হলেও তিনি কারো কাছে হুজুর বা পীর, কারো কাছে মজলুম জননেতা, কারো কাছে 'খামোশ' নামের আতঙ্ক, কারো কাছে 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স'। ১৭ নভেম্বর-২০২০ তাঁর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা' মওলানা ভাসানী দেশের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য সারা জীবন আন্দোলন, সংগ্রামে সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিলো প্রশংসনীয়।

মওলানা ভাসানী দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকাংশ সময়ই টাঙ্গাইলের সন্তোষে কাটিয়েছেন। সন্তোষের জমিদার উচ্ছেদের পর এই জমিদারীর বিশাল এলাকা জুড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯টি কারিগরি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আজ সন্তোষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহাসিক মওলানা মোহাম্মদ আলী (এম এম আলী) কলেজ। সন্তোষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুড়েই রয়েছে মওলানার শত-সহস্র স্মৃতি। গ্রামবাংলার চিরচেনা ভাসানী হুজুরের কুঁড়ে ঘর, ঐতিহাসিক দরবার হল, সন্তোষ দীঘি প্রভৃতি আজো কালের স্বাক্ষী।

হুজুর ভাসানীর জন্ম ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে। জীবনের শুরুতে মজবে শিক্ষা গ্রহণ এবং মজবেই কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯০৩ সালে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। এ সময় ১০ মাস কারা ভোগ করেন। ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলন করেন। সেই থেকে তার নামের সাথে ভাসানী শব্দ যুক্ত হয়। ১৯৩১ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় এবং ১৯৩৩ সালে গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রক্তভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারী ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রক্তভাষা কর্মপরিসদ গঠিত হয়। তিনি এর অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে রক্তভাষা আন্দোলনে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুসলিম আওয়ামী লীগের (বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের জননেতা শামসুল হক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৬ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকায় অনশন করেন। মওলানা ভাসানী ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ এ মামলার সকল আসামীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী উত্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তিনি সমর্থন দেন। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। এসময় তিনি ভারতে ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং একই বছর ২৫ ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুজিব সরকারের ব্যাংক বীমা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণনীতি ও ১৯৭২ সালে সংবিধানের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। তিনি ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ইস্তফা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন মওলানা ভাসানী। সেই সাথে বাঙালী জাতিসত্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের নেতা। দেশের মুকুটধীন সম্রাট।

সবুজ, শ্যামল গাছ-গাছালীতে ঘেরা মনোরম পরিবেশে ঘেরা সন্তোষ। কবে, কখন হুজুর ভাসানীকে দেখেছিলাম তার দিন তারিখ মনে নেই। তবে এটুকু স্মৃতিতে চির ভাস্বর যে ঐ দিন সকালে সন্তোষের কুঁড়ে ঘরের সামনেই চেয়ারে বসেছিলেন মওলানা ভাসানী। পড়েন ছিলেন সাদা পাঞ্জাবী আর চেকের লুঙ্গী। মাথায় বেতের টুপি। তাঁর আশেপাশে কয়েকজন ভক্ত। আমার জন্মস্থান টাঙ্গাইলের পৌরসভাধীন ভালুকান্দী গ্রাম থেকে সন্তোষের দূরত্ব কয়েক কিলোমিটার। হাঁটা পথে ৪০/৫০ মিনিটের পথ। রিক্সায় দূরত্ব ২০/২৫ মিনিট। কার সাথে কেনো, কিসের টানে সেদিন সন্তোষ গিয়েছিলাম তার স্মরণ করতে পারছি না। তবে বলতে দ্বিধা নেই ঐ একদিনের এক মুহূর্তের দেখা যেনো শত বছরের চেনা একজন মানুষ। এরপর হুজুর ভাসানীকে দেখতে যাই ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর। সেদিন তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে সন্তোষ আনার পর। হুজুর ভাসানীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শত-সহস্র সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে সন্তোষে। হেলিকপ্টারে হুজুরের মরদেহ নিয়ে আসা হয় সন্তোষে। বিকেলে তার প্রিয় প্রাঙ্গণেই দাফন করা হয় তাঁর মরদেহ। যা আজ 'ভাসানীর মাজার' নামে পরিচিত।

১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বরের পর থেকে প্রবাসী জীবনের আগ পর্যন্ত অন্তত এই দিনটিতেই সন্তোষ যেতাম প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে মানুষের ঢল দেখেছি সন্তোষে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত মানুষ আসতেন প্রাইভেট কার আর বাস যোগে। কখনো কখনো ৫দিন বা ৭দিন ধরে আয়োজন হতো নানা অনুষ্ঠানের। বিশেষ করে ১৭ নভেম্বর ভক্তদের জন্য রান্না করা তবারক (খিজুরি) পরিবেশন করা হতো ঐতিহাসিক নৌকা থেকে। টাঙ্গাইল সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ভক্তদের দেয়া অনুদানের অর্থ, দানকৃত গরু, ছাগল, খাসী, চাল-ডাল, শাক-সবজী, মরিচ মসলা দিয়েই তৈরী হতো তবারক। সেই স্মৃতি ভুলার নয়।

আমরা টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের প্রায় সকল সদস্য মিলেই সন্তোষে যেতাম ১৭ নভেম্বরের অনুষ্ঠান কভার করতে। (পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা ১১)





ছবি : ফারাফা মিছিল

কিংবদন্তির মহানায়ক মওলানা ভাসানী

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ইতিহাসের এক কিংবদন্তির মহানায়ক। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন তিনি। মহান এই নেতার সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন কিংবা তার সম্পর্কে কোনো মূল্যায়ন আমার মতো একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই নয়।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর পাসপোর্ট অনুসারে তার জন্ম ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অভিপ্রায়ে ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে মজলুম এ জননেতার জন্মদিবস পালন করা হয়। তখন তিনি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সাইন্সেস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার জন্মস্থান সিরাজগঞ্জে। পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। পিতামহের নাম হাজী কেরামত আলী খান। তার পিতা ও পিতামহের নামের আগে হাজী থেকেই বোঝা যায়, সেই সময়কালে তারা উচ্চমধ্যবিত্ত ছিলেন। মওলানা ভাসানীর শুরুর ছিলেন জয়পুরহাটের বীরনগর এলাকার জমিদার শাকির উদ্দিন চৌধুরী। শৈশবে পিতৃমাতাকে হারিয়ে বড় চাচা হাজী ইব্রাহিম আলীর কাছে প্রতিপালিত হন তিনি। মাদরাসা শিক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু করেন শিক্ষাজীবন।

মওলানা ভাসানী শুরু থেকেই শোষণ-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন বরোখী জনমানুষের নেতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, অবহেলিত মানুষকে রক্ষা ও মানবতার সেবা করার নামই রাজনীতি। মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর খেলাফত আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আসামে 'বাঙ্গাল খেদাও'

অভিযানের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ভাষানচর নামক স্থানে এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানেই তাকে ভাসানী উপাধি প্রদান করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আসাম ও বাংলায় জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তিনি। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং ১৯৩১ সালে মওলানা শওকত আলী ইন্তেকাল করলে মওলানা ভাসানী ১৯৩৫ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের রাজনীতিতে

মওলানা ভাসানীই প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। ভাসানী নিজে ওই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন, সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক। সহ-সভাপতি মনোনীত হন আতাউর রহমান খান ও আব্দুস সালাম খান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ হন যুগ্ম সম্পাদক। এভাবেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধী দলের গোড়াপত্তন করেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় সর্বদলীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হন তিনি। সেই সময় শাসকগোষ্ঠী মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শামসুল হককে বিনা কারণে বার বার গ্রেফতার ও জেল-হাজতে নিষ্ক্ষেপ করে। মজলুম জননেতা ওই সময়



শেখ শওকত হোসেন নিলু

ইউরোপ সফর করেন এবং বিশ্বের যুবকবিরোধী শান্তি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে নিপীড়িত জনগণ ও দেশগুলোর স্বাধীনতার জন্য মতবিনিময় করেন। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে '৫৪ সালের নির্বাচনে নুরুল আমিনসহ মুসলিম লীগের বড় বড় নেতারা পরাজিত হন। মাত্র ৯টি আসন পায় মুসলিম লীগ। ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং মুসলিম লীগে যোগদান করে ১০ জন সাংসদ নিয়ে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু রক্ষীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে মওলানা ভাসানীর দাবির (প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন) প্রতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্ণপাত না করায় এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করার প্রতিবাদে তিনি ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে এক ঐতিহাসিক সম্মেলন আহ্বান করেন। মজলুম জননেতা সেই সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'আসসালামু আলাইকুম' দিয়ে বলেন, তোমরা

ভালো থাকো, আমাদেরও নিজেদের মতো করে ভালো থাকতে দাও। এর মাত্র চার মাস পরে নিজ প্রতিষ্ঠিত দল ত্যাগ করে তিনি গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে থেকে যান নবাবজাদা নাসিরউল্লাহ খান, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, আব্দুস সালাম খান, তাজউদ্দীন আহমদ ও মিসেস আমেনা বেগমরা। আর মওলানা ভাসানীর সঙ্গে থাকেন সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান, সিদ্ধু প্রদেশের জিয়েসিন্দ, পাঞ্জাবের মিসেস কানিজ ফাতেমা, অলি আহাদ, মাহমুদ আলী, হাজী মো. দানেশ, আব্দুস সামাদ আজাদ, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, মো. তোহা ও আব্দুল মতিনরা। মওলানা ভাসানী পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবি তোলেন। অন্যদিকে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীরা বলেন, আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইতোমধ্যেই ৯৫ শতাংশ স্বায়ত্ত শাসন অর্জিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংগঠনিকভাবে থেকে গেলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। কিন্তু তার অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে গেল মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। এখানে উল্লেখ

করতে হয় বেগম মুজিবের ভূমিকার কথা। তিনি রাজনীতিতে কোনো দিনই প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেননি। কিন্তু পর্দার আড়ালে থেকে বঙ্গবন্ধুর হয়ে আজীবন সমস্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মরহুম কাজী জাফর আহমদের বক্তব্য অনুসারে, ১৯৭৩ সালে তিনি ন্যাপের মহাসচিব মনোনীত হন। সেই বছর পবিত্র ঈদ উপলক্ষে পার্টির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানীর জন্য পাজামা-পাঞ্জাবি কেনেন এবং সেটা তাকে উপহার দেন। মওলানা ভাসানী তখন বলেন, কামালের মা (বেগম মুজিব) প্রতি বছর তাকে ঈদের জামুকাপড় দেন এবং সেই জামা-কাপড় পরেই তিনি ঈদের নামাজ আদায় করেন। সুদীর্ঘ দিন এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এ থেকে বুঝতে হবে, ভাসানী-মুজিব সম্পর্কের গভীরতা। ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র যখন পাকাপোক্ত, তখন মোনাজাতের নামে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেন মওলানা ভাসানী। লক্ষ লক্ষ ছাত্রজনতা যুক্ত হলেন তার মোনাজাতে। আওয়াজ উঠলো-জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব। মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন বর্জন করে স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে সমগ্র বাঙালী জাতিকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেন। ইতিহাসে একমাত্র পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কৌশলে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন নিজ পুত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্য। আর মওলানা ভাসানী পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন পুত্রতুল্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা

করেছিলাম, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতিবসুও আপনাকে ভালোবাসেন। এরপরেও আপনি ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ভারত একটি আধিপত্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে সম্প্রসারণবাদী হিসেবে। হায়দরাবাদ-জুনাগড়-কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে তারা ভারতের মানচিত্র সম্প্রসারিত করেছে। শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু সেজন্য কাশ্মীর অধিগ্রহণ থেমে থাকেনি। সিকিমকেও অধিগ্রহণ করেছে ভারত। শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন জাতীয়তাবাদী নেতার কারণেই বাংলাদেশকে অধিগ্রহণ করতে পারেনি ভারত। মওলানা ভাসানী আরো বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সমস্ত দেশে মিগ্রবাহিনী পপ্রবেশ করেছিল, তাদের সেনাবাহিনী আজও সেই সকল দেশে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক শিষ্টাচারের কারণেই মূলত বাংলাদেশ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে ভারত। কিন্তু ভারতের একটি প্রশাসনিক মহল তা মেনে নিতে পারেনি বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ৫৭ দিনের মাথায় ছাত্রলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

(পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা ৭)



ছবি : ফারাক্কা বাঁধ

হয় আওয়ামী লীগের খন্দকার মোশতাক আহমেদ। ওই বছরের ৩ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে মোশতাক সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়। এরপর ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থানে জেনারেল খালেদ মোশাররফ নিহত হন। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শহীদ জিয়াউর রহমান।

১৯৭৬ সালের ১৬ মে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দেশবাসী এই মিছিলকে ফারাক্কা লংমার্চ হিসেবে আখ্যায়িত করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ এক চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়। বাকশাল ও সামরিক শাসনের ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার প্রতিবাদে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সীমান্ত অস্থির হয়ে পড়ে। সর্বোপরি ফারাক্কার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের উত্তর জনপদ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এমন

অবস্থায় মওলানা ভাসানী ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে এক ঐতিহাসিক লংমার্চ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মজলুম জননেতা সেই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার পিজি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সময়টা সম্ভবত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। বাংলাদেশ লেবার পার্টির সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব আমাকে হজুরের সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে যান। হজুর পূর্বেই আমাকে চিনতেন। হজুর আমাকে লংমার্চের ধারণা প্রদান করেন এবং তার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানান। আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে ফারাক্কা লংমার্চের সাংগঠনিক কাজ শুরু করি। মওলানা ভাসানী এই ফারাক্কা লংমার্চ পরিচালনা কমিটির আহবায়ক মনোনীত হন। ন্যাপ ভাসানী, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), হাজী দানেশ ও সিরাজুল হোসেন খানের নেতৃত্বাধীন জাগমুই এবং বাংলাদেশ লেবার পার্টি-এই পাঁচটি দল থেকে দু'জন করে সদস্য নিয়ে পরিচালনা পর্যদ গঠন করা হয়। বাইরে থেকে মাত্র দু'জনকে এই পরিচালনা পর্যদে মনোনয়ন প্রদান করেন

মওলানা ভাসানী। একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম এনায়েতুল্লাহ খান এবং অন্যজন আমি শেখ শওকত হোসেন নিলু।

১৯৭৬ সালের ১৫ মে সকাল ১০ ঘটিকায় মওলানা ভাসানীর মাদরাসা ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কথা। ১৪ মে সন্ধ্যার মধ্যেই দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের নেতাকর্মীরা দলে দলে এসে উপস্থিত হতে থাকেন রাজশাহীতে। চট্টগ্রাম থেকে ব্যারিস্টার সলিমুল্লাহ খান মিলকী, বরিশাল থেকে শ্রী সুনীলগুপ্ত ও সিরাজুল হক, খুলনা থেকে গাজী শহিদুল্লাহ, ফরিদপুর থেকে ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন, যশোর থেকে তরিকুল ইসলাম এবং ঢাকা থেকে সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত হন রাজশাহীতে। এছাড়া মশিউর রহমান যাদু মিয়া, এস এ বারী এটি, কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, আব্দুল মান্নান হুঁইয়া, হায়দার আকবর খান রনো ও মাওলানা আব্দুল মতিনরা ১৪ মে'র মধ্যেই রাজশাহীতে উপস্থিত হন। ১৫ মে সকাল ১০টার মধ্যেই মাদরাসা ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি রুষ্টি হচ্ছিল। মওলানা ভাসানী একটি খোলা জিপে করে আবু

নাসের খান ভাসানী, এমরান আলী সরকার ও গাজী শহিদ উল্লাহকে নিয়ে ১০টা বাজার ৫ মিনিট আগে মাদরাসা ময়দানে উপস্থিত হন। লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে- 'যুগ যুগ জিও তুমি মওলানা ভাসানী; সিকিম নয় ভুটান নয় এদেশ আমার বাংলাদেশ'। জনসভায় একমাত্র বক্তা মওলানা ভাসানী। দোয়া পরিচালনা করেন লেবার পার্টির সভাপতি মাওলানা আব্দুল মতিন। এরপর ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মজলুম জননেতা ইন্তেকাল করেন। সুতরাং ১৫ মে'র মাদরাসা ময়দানের জনসভাই তার জীবনের শেষ জনসভা ও ভাষণ। এক ঘণ্টা সময় নিয়ে তিনি তার ভাষণ দেন। গুঁড়ি গুঁড়ি রুষ্টির মধ্যে একজন লোকও নড়াচড়া করেননি। জনসভা ছিল নিশ্চল। মওলানা ভাসানী তার রাজনৈতিক জীবনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারত একতরফাভাবে ভারত দেশের জনগণের পানি কেড়ে নিয়ে এই অঞ্চলে এক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, হাজার বছরের এই অঞ্চলে মাটি-পানি এবং কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতীদের সমন্বিত শ্রমের মধ্য দিয়ে এক সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। সেই পানির স্বাভাবিক প্রবাহের ওপর বাঁধ নির্মাণ করে

বাংলাদেশের উপরে এক মরণযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ভারত। এই ফারাক্কা বাঁধের ফলে ১০ লক্ষ জেলে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে। কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমুদ্রের মধ্যে পলি পড়ে বাংলাদেশের যে নতুন ভূখণ্ড জেগে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। ভারতের শাসকরা বাংলাদেশের বন্ধু জনগণকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না, ধ্বংস করতে পারে না সভ্য জনসমাজকে।

বেলা ১১টায় রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হয় লক্ষ লোকের গণমিছিল। মওলানা ভাসানী একখানা খোলা জিপে করে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। মিছিলের নেতাকর্মীদের আপ্যায়নের জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, নারী-পুরুষ, ছাত্র-কৃষক সকলেই ছুটে আসে কাঁচা আম, মুড়ি, পানি ও লেবুর শরবত নিয়ে। এভাবেই গড়ে ওঠে এক ঐতিহাসিক গণজাগরণ। আমরা বিকেল ৫টার মধ্যেই চাঁপাইনবাবগঞ্জে পৌঁছে যাই। ছাত্র সংগ্রাম

কমিটির নেতৃত্বে সেখানে এক ঐতিহাসিক মশাল মিছিল বের হয়। আমি, গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আব্দুর রাজ্জাক সরকার ছাড়াও এসকেন্দার আলী ও রাজশাহীর মিলন এই মশাল মিছিলের অগ্রভাগে ছিলাম। চাঁপাইনবাবগঞ্জ মশালের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। পরদিন ১৬ মে সকাল ৬টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সোনামসজিদ অভিমুখে মিছিল শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষ ফারাক্কা বাঁধের দুই মাইল ভাটিতে সোনামসজিদ প্রান্তণে উপস্থিত হয়। এরপর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লংমার্চের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জাতীয় জীবনে জাতীয় ঐক্যের বুনয়াদ সৃষ্টি হয় এই ঐতিহাসিক লংমার্চের মাধ্যমে। বিশ্বের দেশে দেশে বাংলাদেশের পানির ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় মজলুম জননেতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এবং সাবেক আহবায়ক, এনডিএফ। তিনি ২০১৭ সালের ৬ মে ইন্তেকাল করেন। লেখাটি পুনর্মুদ্রিত।

সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ নভেম্বর ২০১৬

রাষ্ট্রপতির বাণী

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল সমাজে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ, কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনগণ। 'তেভাগা' ও 'লাঙল যার জমি তার' আন্দোলনসহ তিনি অধিকার বঞ্চিত অবহেলিত মেহনতি মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। জাতীয় সংকটে জনগণের পাশে থেকে তিনি দুর্বীর আন্দোলন গড়ে

তুলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দেশ ও জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সবসময় ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। ক্ষমতার কাছে থাকলেও ক্ষমতার মোহ তাঁকে কখনো আকর্ষিত করেনি। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন নির্মোহ, অনাড়ম্বর ও অত্যন্ত সাদাসিধে। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম

ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক-এ প্রত্যাশা করি। আমি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"-খবর পিআইডি'র।

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঔপনিবেশিক শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার ও প্রতিবাদী। বাঙালী জাতিসত্তা বিকাশে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর আদর্শিক একা ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। শোষণ, বঞ্চনাইন, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন তিনি। আমি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।"-খবর পিআইডি'র।

আপনার খবরের সর্বোচ্চ প্রচারে যোগাযোগ করুন-

ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা



Contact : +1 347-848-3834

ক্ষমা করো মওলানা ভাসানী

স্টালিন সরকার

‘হায়! আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী/ বল্লমের মত ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার/ অতিদ্রুত স্ফীত হয়; স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবী/ যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবী দিয়ে সব/ বিক্ষিপ্ত বেআবরু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান’ (শামসুর রাহমান)।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর রমজান মাসে দক্ষিণাঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ মানুষের লাশ বঙ্গোপসাগরে ভেসে যায়। ওই সময় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো মওলানা ভাসানীকে ‘সফেদ পাঞ্জাবী’ নামক কবিতার চিত্রপটে এভাবেই ঐকেছেন কবি শামসুর রাহমান। পৃথিবীর নিপীড়িত-নির্যাতিত গণমানুষ এবং মজলুমের এই নেতাকে ‘মসনদ’ বা ‘ক্ষমতার লালসা’ কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। নিজের ভাগ্য বিসর্জন দিয়ে সারাজীবন নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘড়ানোর রাজনীতি করেছেন। সেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। গত কয়েক শতকে বিশ্বে যত বরণ্য রাজনৈতিক জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের অন্যতম মওলানা ভাসানী। অথচ তার জন্মদিন-মৃত্যুদিনে শুধু কবরে ফুল, একটি-দু’টি সেমিনার ইদানিং টিভির টকশোতে দু’একটি বক্তব্যের মধ্যেই আমরা দায় সারছি। মহাত্মাগান্ধী ও নেহেরুরূপে ভারতে, নেলসন ম্যান্ডেলকে দক্ষিণ আফ্রিকা, মাও সেতুংকে চীনের রাজনৈতিক দল, মিডিয়া ও মানুষ যেভাবে স্মরণ করে থাকে; আমরা কেন সেভাবে ভাসানীকে স্মরণ করছি না? সারাবিশ্বের নিপীড়িত অহেলেত মানুষের নেতা মওলানা ভাসানী কি অবহেলিতই থেকে যাবেন? নতুন প্রজন্মের কাছে থাকবেন অপরিচিত!

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে জন্ম নেয়া আজকের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ওই কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। চলমান আত্মকেন্দ্রীক রাজনীতির কানাগলির কারণে ভাসানীকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন না হতে পারে; কিন্তু নতুন প্রজন্মকে কি তাঁর সংগ্রামী জীবনের পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত নয়? এ দায় কার? রাজনীতিকরা না হয় স্বার্থবাদী দলীয় গণ্ডির মধ্যে বন্দী; কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নীরব কেন? আগামীতে যারা দেশ গড়বেন তাদের সামনে মওলানা ভাসানী হতে পারেন অনুসরণীয়-অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ভাসানীকে চর্চা করলে বর্তমানের সময়ের ‘ক্ষমতা লিপ্সার রাজনীতি’র বাইরের ‘জনসেবার রাজনীতি’ প্রতি নতুন প্রজন্ম উৎসাহী হবেন। দেশের রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতি সৈবী, মিডিয়াগুলো কত খ্যাতি-অখ্যাতিদের স্মরণে মাতামাতি করে।

ভাসানীকে নিয়ে কই তাদের আয়োজন? একজন গানের শিল্পী-একজন সিনেমার নায়ককে নিয়ে যেভাবে মিডিয়াগুলো মাতামাতি করে; তার সিকি ভাগ মাতামাতির দাবি কি ভাসানী রাখেন না? ভাসানীর ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে সবাই কি ঘুমিয়েই থাকবেন? নাকি ফুল দিয়েই দায় সাড়ানো হবে? মওলানা ভাসানী শুধু বাংলাদেশ ও ভারত মহাদেশের নয়; তিনি আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার গণমানুষের নেতা ছিলেন। পশ্চিমা দুনিয়ার গণমাধ্যম তাঁকে ‘ফায়ার ইটার’ বা অগ্নিভুক, ‘রেড মুলানা অব দ্য ইস্ট’ বা প্রাচ্যের ‘লাল মওলানা’ ইত্যাকার বিশেষণে চিত্রিত করেছেন নিজেদের মতো করে। স্রষ্টাভাবী আমেরিকার বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার মওলানা ভাসানীকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে ‘প্রোফেট অব ভায়োলেন্স’ বা সহিংসতার ধর্মপ্রবর্তক তকমা দেয়া হয়। কারণ কি? আমেরিকানরা ভাসানীর ওপর চটলো কেন? যিনি গণমানুষের নেতা তাঁকে নিয়ে আমেরিকার কেন এই বিয়োগার? কারণ আর কিছু নয়। ১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে ৩ ডিসেম্বর শের-এ-বাংলা এ কে. ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং মওলানা ভাসানী-হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যৌথ নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ওই ফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পররাষ্ট্রনীতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ‘নতজানু’ হওয়ার প্রতিবাদ করেন ভাসানী। অতপর মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে চীনপন্থী হিসেবে আবির্ভূত হন। আওয়ামী লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মার্কিনপন্থী হওয়ায় ভাসানী দলের অভ্যন্তরে তীব্র প্রতিবাদ করেন। যার ফলে ভাসানী স্রষ্টাভাবী যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষুতে পরিণত হন। মওলানা ভাসানী আজকের আওয়ামী লীগ (নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এই দুটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা। সারাজীবন ‘পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/এ মন প্রাণ সকলি দাও’ কবিতার মতোই ‘পরের’ খেদমত করে গেছেন। পাকিস্তান সরকার সকল রাজনীতিদের মতো ভাসানীর নামেও ধানমন্ডিতে পুট বরাদ্দ দিয়েছিল। সব নেতাই পুট নিয়ে বাড়ি করেছেন; অথচ ঘূর্ণিভাবে পাকিস্তান সরকারের দেয়া পুট প্রত্যাখ্যান করেছেন মজলুম এই নেতা। থাকার জায়গা বেছে নিয়েছেন কুড়িঘর।

মূলত ভাসানীর ডাকে ১৯৫৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ওই সম্মেলনে মওলানা ভাসানী প্রথম হুংকার দেন এই বলে যে, ‘পূর্ববাংলা

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের দ্বারা শোষিত হতে থাকলে পূর্ববঙ্গবাসী তাদের আসসালামু আলাইকুম জানাবে’। এই সাহসী উচ্চারণের মাধ্যমে ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টায় আবির্ভূত হন। এ ছাড়াও কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করায় ১৮ মার্চ তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ওই বছরের ২৫ জুলাই তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’ (ন্যাপ) গঠন করেন। সেখানে জড়ো হন এক বীক বামপন্থী। বাংলাদেশের রাজনীতির জীবন্ত কিংবদন্তী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, মতিয়া চৌধুরী, আহমেদুল কবির, সুরজিত সেনগুপ্ত, আবদুল্লাহ আল নোমান, মোহাম্মদ আফজালসহ শত শত জাঁদরেল নেতা ছিলেন তার অনুসারী। ন্যাপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে আমেরিকা বিরোধী শিবির বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ইসলামী চেতনা ও ভাবধারা থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি। মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার কৃষক-প্রজাদের নিয়ে সামন্ত-জমিদার বিরোধী লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। আসামে ‘বঙ্গাল খোদা’ নামের জনগোষ্ঠীগত হিংস্রতা রুখে দিয়ে এবং কুখ্যাত লাইন প্রথাবিরোধী সংগ্রামে সামনের কাতারে থেকেই নেতৃত্ব দেন। খেলাফত আন্দোলনের পথ বেয়ে উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে উঠে আসেন ‘সামনের কাতারে’। পাকিস্তান আমলে আমাদের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতিক বিকাশের তিনিই ছিলেন প্রথম তুর্বাদক। নিজের জীবন তুচ্ছ করে রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের সেবা করার দীক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন। তাকে নিয়ে কত গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচিত হয়েছে; সেগুলো এখন উচ্চারিত হয় না।

শোষণমুক্ত সমাজ গঠন, সাম্য এবং নিপীড়িত মানুষের রাজনীতি করা মওলানা ভাসানীকে কেউ কেউ বলতেন কমিউনিস্ট। দেশের আমেরিকানপন্থী দলগুলোর এতে সাময়িক সুবিধা হতো। ভোটের সময় গণমানুষের কান ভারী করা যেত। কিন্তু ভাসানী মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-র সাম্যবাদী সাহাবি হজরত আবু জর গিফারি’র (রা.) ‘রবুবিয়ত’ দর্শনে গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। খেলাফতে রাব্বানি তথা প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনই ছিল তাঁর সারাজীবনের ব্রত। নির্যাতিত অবহেলিত মানুষের সেবা ও নিজের জীবনাদর্শ প্রচারের জন্য গড়ে তুলেছিলেন খোদায়ী খিদমতগার সমিতি।

ইসলামের সাম্যবাদী ভাবাদর্শ ও সমাজবাদী দর্শনের সংমিশ্রনে একটি শোষণহীন-সাম্য-মৈত্রীর সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল ভাসানীর আত্মজালালিত স্বপ্ন। শোষণ, পীড়ন, স্রষ্টাভাব্য ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে করেছেন জীবনভর লড়াই। লড়াই করতে করতে আসাম থেকে চলে এসেছেন বাংলাদেশে। মাটির ঘরে বসবাস, সাধারণ মানুষের পোশাক, মাটির শানকিতে খাবার খাওয়া ভাসানী ছিলেন কার্যত দুর্বিনীত শাসকদের ত্রাস। তার হুংকারে ‘ক্ষমতার মসদন’ কেঁপে উঠতো। ক্ষমতাসীনদের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে রাশত্বয় সমাবেশ করতে দেবে না! ঠিক আছে সমাবেশ করবেন না। তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতেন নামাজে। তার পিছনে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে যেত। নামাজ শেষে মোনাজাত ধরতেন এবং সে মোনাজাতে সমাবেশের ‘সব বক্তব্য’ তুলে ধরে সরকারকে নাস্ত্রাবাদ করতেন। কেউ তার মুখ বন্ধ করতে সমাবেশের জন্য ২ লাখ টাকা চাঁদা দিয়ে শাশিঞ্জর টেকস তুলেছেন! সমাবেশে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন দুই লাখ টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনতে চাও? এই হলো মওলানা ভাসানী। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালাকেও হার মানাতো তার ডাক। ডাক দিলেই লাখ লাখ মানুষ কাজ ফেলে পঙ্গপালের মতো পথে নেমে আসতেন। মজলুম জননেতার ‘খামোশ’ আওয়াজে কেঁপে উঠেছে জালিমের সিংহাসন। ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে তাঁর লংমার্চ আজো ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে যে ৮ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। ওই উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, কমরেড মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মওলানা ভাসানী কলকাতা, দেহাদুন, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় ভারতে অবস্থানকালে তিনি দুইবার অসুস্থ হন। তিনি ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সাস্তাহিক হককথা প্রকাশ করেন। ১৯৭৪ সালে করা মুজিব-ইন্দিরা মৈত্রীচুক্তির বিরোধিতা করলেও মুজিব সরকারের জাতীয়করণ নীতি এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। ১৯৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ১৫ থেকে ২২ মে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। যার জনসেবা ও কর্মযজ্ঞের ফিরিস্তি লিখলে উপন্যাস-মহাউপন্যাস হয়ে যাবে। যে নেতা এখনো প্রাসঙ্গিক। সেই ক্ষণজন্মা নেতা কি অবহেলিতই থেকে যাবেন? ক্ষমা করো হজুর। (সৌজন্য: দৈনিক ইনকিলাব)



টান্জাইলকে বিশ্বজুড়ে তুলে ধরতেই

আমছি আমরা...



fb.com/bongshai.tv



youtube.com/bongshai tv



bongshai.tv

ভাসানী-বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ও সংহতি

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পারস্পরিক বোঝাপড়া অটুট ছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকার পরও যাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিতৃতুল্য সম্মান করতেন। মওলানা ভাসানীও বঙ্গবন্ধুকে সম্মানতুল্য স্নেহ করতেন। ১৯৫৭ সালে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করলেও সত্তরের নির্বাচন বর্জন ও পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ১১ মার্চ টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় ন্যাপ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান সাত কোটি বাঙালীর নেতা। নেতার নির্দেশ পালন করুন।

স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে মওলানা ভাসানী গুরুতর মতো পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব মসিউর রহমান ১৫ আগস্ট, ২০১৫ দৈনিক কালের কণ্ঠে লিখেছেন, মওলানা ভাসানীর অনুরোধ কখনও উপেক্ষা করা হতো না। একবার বঙ্গবন্ধুকে তিনি চিঠি লিখলেন, তাঁর ওষুধের দরকার। থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুরে চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হই। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধি যারা ছিলেন, তাঁদের বঙ্গবন্ধু অনুরোধ জানালে তাঁরা ওষুধটি পাঠান। মওলানা ভাসানীকে সন্তোষে সেই ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল ভাসানী পল্টনে এক মহাসমাবেশের ডাক দেন। পরে একটি মিছিল নিয়ে রষ্টপতির কার্যালয় ঘেরাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর দিকে যাত্রা শুরু করেন। খবর শুনে রষ্টপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রায় চলে আসেন। মিছিল কাছের আসতেই বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। এ দৃশ্য দেখে হাজার হাজার মিছিলকারী জনতা হতভম্ব। বঙ্গবন্ধু তাঁর ‘হজুর’ ও কয়েকজন নেতাকে সম্মান দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হজুরকে ধরে ধরে নিলেন। ভেতরে বসিয়ে মিষ্টিমুখ করালেন। সার্বিক পরিস্থিতি হজুরের সামনে তুলে ধরলেন। হজুর কিছু পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিলেন।

মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা নিয়ে ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মওলানা পুত্রসম স্নেহ করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘আমার রাজনৈতিক জীবনে অনেক সেক্রেটারি এসেছে, কিন্তু মুজিববরের মতো যোগ্য সেক্রেটারি অন্য কাউকে পাইনি।’ উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকাকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু মওলানাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বাংলাদেশের রষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রায়ই কোনো নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই শুধু গাড়ির ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। সে খবর তৎকালীন আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই জানতেন না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তখন মওলানা ভাসানী খুবই কঁদেছেন। তিনি ওইদিন বারবার বলেছেন, ‘সব শেষ হয়ে গেল!’ তিনি এত দুঃখ



এম. গোলাম মোস্তফা ভূইয়া

পেয়েছিলেন যে, ওইদিন কোনো কিছুই খাননি; কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে রষ্টপতি শেখ মুজিবুর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো অবনতি ঘটেনি। মওলানা ভাসানী-বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে চমৎকার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম। ‘ভাসানীকে যেমন জেনেছি’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন (পৃ. ৭৮) : ‘গভর্নরদের নাম ঘোষণার তিন-চার দিন আগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গণভবনে গেছি। দেখি বঙ্গবন্ধু বের হচ্ছেন। দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোনো কাজ আছে নাকি?’ বললাম, ‘না, এমনিই আপনাকে দেখতে এসেছিলাম।’ বঙ্গবন্ধু আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী একটা টয়োটা গাড়িতে উঠলেন। সাধারণত বাড়িতে ফেরার সময় তিনি মার্সিডিসে ফেরেন এবং একা। আমি ভাবলাম, বঙ্গবন্ধুর পিছু পিছু তাঁর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বাসায় ফিরব। ওমা! গণভবনের গেট ছেড়ে গাড়ি ডানে না গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম, অন্য কোথাও যাবেন। ফার্মগেট থেকে শহরের দিকে না গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলো। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম, অন্য কোথাও যাবেন। ফার্মগেট থেকে শহরের দিকে না গিয়ে গাড়ি ঘুরল টাঙ্গাইলের দিকে। অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে

আমরা যখন চৌরাস্তা পর্যন্ত এলাম, তখনও বুঝতে পারিনি- যাচ্ছেন কোথায়। চৌরাস্তায় এসে পরে বুঝলাম, টাঙ্গাইল যাচ্ছেন। সত্যিই তাই। উনি সন্তোষ গেলেন। বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। বঙ্গবন্ধু ও মনসুর ভাই হজুরের ঘরে গেলেন। আমি প্রায় তিনশ’ গজ পেছনে রাস্তা থেকে দূরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব সন্তোষ তাদের মিনিট চল্লিশেক আলাপ হলো। আবার ছুটলেন ঢাকার দিকে।’ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তৎপর মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করায় ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসনে জিতে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল আওয়ামী লীগ। ওই নির্বাচন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত সময়ে শেখ মুজিবুর প্রতি মওলানা ভাসানীর ‘সমর্থন’ দেওয়ার এই কৌশলকে ‘রীতিমতো মাস্টার ট্রোক’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে আরও একবার স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মওলানা ভাসানী।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার শোকের মাস আগস্ট এলেই দেশে কিছু চাটুকার মুজিব-বন্দনার আড়ালে ইতিহাস

বিকৃতির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, যা আজকের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে। এসব চাটুকার কিছুটা ঘুরিয়ে হলেও সুকৌশলে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মওলানা ভাসানীকে জড়িত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। তারা কখনও কখনও বলে থাকে, মওলানা ভাসানী নাকি খন্দকার মোশতাকের সরকারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ জানাননি। অথচ সত্য হলো, খন্দকার মোশতাকের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল তার সরকারকে সমর্থন করে একটি স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য। কিন্তু মওলানা তার প্রস্তাব সংসারি নাকচ করে দেন। বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিবিদ মওলানাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মওলানা সবার চালাকি বুঝতে পারতেন।

মনে রাখতে হবে, মওলানা ভাসানী কোনো সাধারণ নেতা ছিলেন না। প্রায় ৮০ বছরের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নিজের দেশ ও জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রাম করেছেন আপসহীন ভূমিকায় থেকে। বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনোভাবে মওলানা ভাসানীর কাছে ঋণী। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে গঠিত প্রবাসী মুজিবনগর সরকারকে সংঘাত ও অনৈক্যের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেওয়াও ছিল মওলানা ভাসানীর প্রধান অবদান। তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকার গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর অবস্থানকে যারা বিতর্কিত করতে চায় বা করছে,

তারা মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। তারা মওলানা ভাসানীর অনুসারী ও বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও চেতনার পক্ষের শক্তিকে বিভক্ত রেখে নিজেদের ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। মনে রাখতে হবে, ভাসানী-মুজিবের সম্পর্ক প্রসঙ্গে যাদের সামান্যও ধারণা রয়েছে, তাঁরা নিশ্চয় একবাক্যে স্বীকার করবেন, ‘পুত্রের মতো’ প্রিয় শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোবাসতেন মওলানা ভাসানী।

প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২০১৮ সালের ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সংলাপের কিছু কথা উল্লেখ করতে চাই। সেদিন আমি মওলানা ভাসানী সম্পর্কে কিছু কথা বললে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেছিলেন, মওলানা ভাসানী মহান নেতা। তিনি আমাদের সবার শ্রদ্ধার। তাঁর অমর্যাদা করা কারও উচিত হবে না। ১৯৯৭ সালের ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর মধ্যে ছিল ‘প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক’। এই বিষয়টি বরাবরই তিনি উল্লেখ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই বক্তব্যটুকু থেকে নামধারী ইতিহাসবিদদের শিক্ষা নেওয়া এবং এর মর্মকথা অনুধাবন করা উচিত। মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় নেতা মওলানা ভাসানীর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে চাই, মজলুম জননেতা প্রদর্শিত পথ ভুলে গেলে কিংবা সেই পথ থেকে বিচ্যুত হলে জাতি হিসেবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

মহাসচিব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাপ e-mail : gmbhuiyan@gmail.com

CLASSIFIED WORLD
Buy ▾ Rent ▾ Sell ▾ Tools & Advice ▾ What's New ▾ Property Services ▾ Blog ▾ Help ▾
Sign In My Activity ▾ Post A Property

No more worried Now all in one click
Coming Soon...
classifiedworld.net

Home Loan

Mortgage

Income Tax

Credit Repair

Legal

Home Maintained

* condition apply.

মুক্তিযুদ্ধ, চীন এবং ভাসানী

ভদ্রলোককে চিনতাম না। কোনোকালে তার নামও শুনিনি এবং সামনাসামনি দেখিওনি। তার সাথে আমার মাত্র একবার ফোনে কথা হয়েছিল- তাও প্রায় ষণ্টা দুয়েক ধরে। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম যে, তিনি যথেষ্ট বয়স্ক এবং লেখাপড়া জানা আধুনিক মানুষ। পরিচয়ের প্রথমেই তিনি জানালেন, আমার ব্যাপারে তার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সুদূর কানাডাতে বসে তিনি নিয়মিত আমার লেখা পড়েন, টকশো দেখেন এবং সাম্প্রতিককালে আমি যে ইউটিউব চ্যানেল করেছি সেখানে আপলোড করা ভিডিওগুলোও তিনি নিয়মিত দেখেন। ভদ্রলোক যেভাবে আমার ব্যাপারে তার আগ্রহের কথা বললেন তাতে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। অন্য দিকে, আমার মতো যারা ‘হাডাতে লেখক’ কাম দুর্ভিক্ষবলিত বুদ্ধিজীবী’ তারা যদি কদাচিত্ত করে প্রশংসা পান তবে হঠাৎ করে খুশির জোয়ারে ভাসতে শুরু করেন এবং গর্বের বাতাসে ব্যাঙের মতো নিজের পেট ফুলিয়ে ‘মহামানব’ সাজার ভান করেন। ভদ্রলোকের প্রাথমিক কথা শোনার পর আমিও পেট ফোলানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু তার একটি প্রশ্নে প্রথমে একটু ধাক্কা খেলাম এবং নিজের নির্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা বুঝতে পেরে একেবারে ফাটা বেলুনের মতো চূপসে গেলাম। আমার কাছে মনে হলো- ভদ্রলোকের সাথে কথা না বলে নীরবে তার কথাগুলো শুনলে উপকার হবে। তার যে প্রশ্ন শুনে ধাক্কা খেলাম সেটা হলো আওয়ামী লীগের ‘আওয়াম’ শব্দের অর্থ কী! আমি যখন বললাম- এটার অর্থ ‘জনগণ’, তখন তিনি কিছুটা ভর্তসনার স্বরে বললেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা যদি মওলানা ভাসানী, আওয়াম শব্দের অর্থ ও ইতিহাস এবং ১৯২০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করতে না জানেন তবে তারা কারো দালাল অথবা ভাঁবেদার হয়ে ক্ষণেকের তরে কিছু মধু মেওয়া হাসিল করতে পারবেন বটে- কিন্তু রাজনীতিবিদ হতে পারবেন না। ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি রীতিমতো খামোশ হয়ে গেলাম। তার আলোচনায় জানতে পারলাম যে, তিনি বাংলাদেশে থাকাকালে অধ্যাপনা করতেন এবং পুরো ষাটের দশক তো বটেই, মওলানা ভাসানীর মৃত্যু অবধি তার সাথে ছায়ার মতো ছিলেন। গত ৩০ বছর ধরে তিনি কানাডাতে রয়েছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির ওপর একাধিক গবেষণা করেছেন। বাংলাদেশের তুলনামূলক রাজনীতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির ভূতভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি যেসব কথাবার্তা বললেন তা শুনে আমি রীতিমতো তাজব বনে গেলাম। বাংলাদেশকে কেন্দ্রে করে চীনাদের যে ইদানীংকালের আগ্রহ তা চীনা বিপ্লবের পরপরই শুরু হয়েছিল। মাও সেতুং, চৌ এন লাই প্রমুখের মতো কিংবদন্তি চৈনিক নেতারা প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। তারা যেভাবে মওলানা ভাসানীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন অমনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোনো দেশের রাজপথের রাজনৈতিক নেতার সাথে করেননি। চীনের সাথে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল এ রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর থেকেই। কিন্তু তার পরও চীন চাইত, পূর্ব বাংলা স্বাধীন হোক। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে চীন পাকিস্তানের জন্য দ্বৈত পররাষ্ট্র নীতি চালু করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য চীন একদিকে যেমন সর্বময় ঝুঁকি নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলা স্বাধীনতা লাভ করুক তার জন্য একটি মাস্টারপ্লান

তৈরির পর পূর্ব বাংলায় মাওবাদী আন্দোলনে মদদ দিতে আরম্ভ করে। চীন আশঙ্কা করেছিল যে, পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ধরে রাখতে পারবে না এবং সে ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলায় যদি স্বাধীনতার আন্দোলন সুতীত্র না হয়, তাহলে পূর্ব বাংলাকে ভারত অনায়াসে দখল করে নেবে। এজন্য তারা ১৯৫৭ সালেই মওলানা ভাসানীকে দিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরা প্রায় সবাই কমবেশি জানি, ভাসানীর এক সময়ের রাজনৈতিক সহকর্মী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং সিআইএ’র মদদে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ‘পূর্ববঙ্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে’ ভারত-আমেরিকার দোসররূপে সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া আওয়ামী লীগের বিরূপ অংশ যেরূপ মানতে পারেনি তদরূপ মওলানা ভাসানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও তা মেনে নেননি। উপরোক্ত অবস্থার পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী এবং তার দোসরদের দেশবিরোধী চক্রান্তের প্ তি বা দ জানানোর জন্য ১৯৫৭ সালের ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত টাঙ্গাইলের কাগমারীতে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়।



গোলাম মাওলা রনি

মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে বলেন, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকলে পূর্ববঙ্গবাসী তাদের ‘সালামু ওয়ালায়কুম’ জানাতে বাধ্য হবে। ভাসানীর এই বক্তব্যকেই আমাদের মহান স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বা বীজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি কাগমারী সম্মেলনে আমেরিকার সাথে কৃত সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং তার দোসররা সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগকে ভাসানী পরিস্থিতির চাপে ভারতপন্থী এবং মার্কিনপন্থী নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আলাদা রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। তিনি লক্ষ করলেন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পরও পূর্ববঙ্গে সেই সরকারকে টিকিয়ে রাখা যায়নি কিছু নেতার দুর্নীতি, অপরিস্ফুটতা এবং সিনিয়র নেতাদের অস্বচ্ছন্দতার পাশাপাশি ‘সোহরাওয়ার্দীর উচ্চাভিলাষের কারণে’। পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের সরকারের পতন ঘটানো হলে সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বি গ্রেড-সি গ্রেড নেতাকে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী বানানো হবে এমন লোভ দেখিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বারোটা বাজানো হয়। এখানে পূর্ববঙ্গের সর্বনাশ ঘটানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্তারা যেমন যুক্তফ্রন্টের একাংশকে মদদ দেন, তেমনি এই গ্রুপটি ভারত ও আমেরিকার মদদ লাভ করে পূর্ববঙ্গে চীনের প্রভাবকে কবর দিয়ে ভারতের জন্য একটি বলয় তৈরি করার মানসে উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন বটে কিন্তু ভারত-মার্কিন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের সমন্বয় করতে না পেরে কেবল ক্ষমতাই হারালেন না; বরং সব পক্ষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে রাজনীতিতে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হতে শুরু করলেন। সোহরাওয়ার্দীর ব্যর্থতার কারণে পশ্চিম

পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলা একই সাথে উত্তাল ও টালমাটাল হয়ে পড়ে। ফলে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চীন সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। আইয়ুব খান ‘চীনপন্থী’ হওয়া সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীকে তার ক্ষমতার জন্য পূর্ববঙ্গে এক নম্বর শত্রু মনে করতেন এবং তিনি জানতেন যে, পূর্ববঙ্গের স্বার্থের প্রশ্নে ভাসানী কারো সাথেই আপস করবেন না। অধিকন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে সারা পূর্ববঙ্গে যে জনপ্রিয়তা এবং রাজনীতির ময়দানে প্রভাব প্রতিপত্তি ভাসানীর ছিল তার একাংশও অন্য কোনো নেতার ছিল না। শেরেবাংলা ফজলুল হকও জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার বার্ষিক্য, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং পশ্চিম পাকিস্তান ভীতি ও ক্ষমতার লোভের কারণে শেষ বয়সে তিনি রীতিমতো ‘অখর্ব’ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে বাংলার রাজনীতির ময়দানের সিংহ শার্দুল ম ও ল া ন া ভ া স া নী ই ি ছ লে ন সামরিকজাত্যার প্রধান টার্গেট। ফলে সামরিক শাসন জারির পাঁচ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের ১২ অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং দীর্ঘ চার বছর ১০ মাস কারাভোগের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। ভাসানীকে মুক্তি দেয়ার জন্য পূর্ববাংলায় গণআন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। অন্য দিকে, চীনও আইয়ুব খানকে চাপ দিতে থাকে। ফলে ভাসানী মুক্তি লাভ করেন। অন্য একটি কারণেও আইয়ুব শাহী ভাসানীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কারণ তিনি জেলে থেকে নিরাপদে যেমন রাজপথের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তেমনি জেলের অভ্যন্তরে অনশন ধর্মঘট করে সরকারকে বিরত করছিলেন। বিশেষ করে ১৯৬২ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি অনশন করেন বন্যাদুর্গতদের সাহায্য এবং পাটের ন্যায্যমূল্যসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য। এ অবস্থায় সরকার তাকে নভেম্বর মাসের তিন তারিখে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে বের হয়ে তিনি দেখলেন যে, সারা দেশে ভারতীয় এজেন্টরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং একের পর এক পূর্ববাংলা বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে এই অঞ্চলকে ভারতীয় রাজ্য বানাবার নীলনকশার বাস্তবায়নে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই অবস্থায় চীনের পরামর্শে তিনি ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে চীন ভ্রমণে গিয়ে প্রায় সাত সপ্তাহ কাটিয়ে দেশে ফেরেন। মওলানা ভাসানী ১৯৬৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং রাজপথের অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে একত্র করে ‘সম্মিলিত বিরোধী দল’ গঠন করেন, যাকে সংক্ষেপে ‘কপ’ বলা হতো। তিনি ১৯৬৪ সালে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই পূর্ববঙ্গে যদি প্রবল জাতীয়তাবোধের সংগ্রাম তীব্র করা না যায় তবে সম্ভাব্য যুদ্ধে পূর্ববঙ্গে ভারতীয় আধিপত্য ঠেকানো যাবে না। মওলানা ভাসানীর এই দূরদর্শিতার কারণে ১৯৬৪

থেকে ১৯৬৬ সাল অবধি পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ নির্যাতন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে পুরো দেশ এতটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ অরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও ভারত পূর্ববঙ্গে তৎপরতা চালাতে সাহস পায়নি। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুবের পতন এবং ইয়াহিয়া-ভুট্টোর উত্থানে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কিছু দিনের জন্য চীনা কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করেন যে, মূলত আমেরিকা ও ভারতের কূটনৈতিক চালে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং ভুট্টো গংদের আবির্ভাব হয়। পাকিস্তানের নয়া শাসকেরা পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে এমন উদাসীনতা দেখান এবং ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের রূপরেখা অনুযায়ী এমন সব কুকর্ম আরম্ভ করেন যার ফলে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মওলানা ভাসানী তার সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দরুন বুঝতে পারছিলেন, ১৯৭০ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ নিয়তির ঋগ্নের পড়ে গেছে যেখানে পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া তার মতো রাজনীতিবিদের তখন কিছুই করার ছিল না। তবুও তিনি ১৯৭০ সালের প্রবল বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে অনশন শুরু করেন। ১২ নভেম্বর ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বাংলাদেশের পুরো দক্ষিণ অঞ্চল তছনছ হয়ে পড়ে। এই অমানবিক অবস্থায় সাধারণ নির্বাচন সম্ভব নয়- এই কথা বলে তিনি নির্বাচনকে ‘আঁতাতের নির্বাচন’ আখ্যা দিয়ে তা বয়কট করেন। এরপর ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের বিরাট সমাবেশে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি পেশ করেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের কালো রাতে মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে তার নিজ গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, পাকিস্তান-ভারত-আমেরিকা এবং তাদের দোসররা তাকে ছাড়বে না। তাই তিনি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সন্ধ্যা রাতে সন্তোষ ত্যাগ করে সিরাজগঞ্জে চলে যান। হানাদাররা সন্তোষে গিয়ে তাকে না পেয়ে তার বাড়িখর সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হারখার করে দেয়। হানাদাররা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তার ব্যক্তিগত অনুরাগী, আসামের মইনুল হক চৌধুরীর হস্তক্ষেপে আসামের ফুলবাড়িতে আশ্রয় পান। সেখান থেকে ভারতীয় গোয়েন্দারা মওলানা ভাসানীকে কলকাতা নিয়ে যান এবং পার্ক রোডের কোহিনুর প্যালেসের পঞ্চম তলায় নজরবন্দী করে রাখেন। তিনি বাংলাদেশে ফেরেন ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী এবং একই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক ‘হক কথা’ নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ঘোষণা দেন- ‘আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।’ মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপরোক্ত কথাগুলো প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আরো সর্বিস্থায়ে শুনছিলাম আমার সেই প্রবাসী মুরব্বির কাছ থেকে। আমি অধীর আগ্রহে বাকি ইতিহাস শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিলাম। কিন্তু কী কারণে যেন টেলিফোনের লাইনটি কেটে গেল। অনেক চেষ্টা করেও পুনঃসংযোগ পেলাম না। ফলে সেদিনের আলোচনা অসমাপ্তই রয়ে গেল। লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

CLASSIFIED WORLD

Buy ▾ Rent ▾ Sell ▾ Tools & Advice ▾ What's New ▾ Property Services ▾ Blog ▾ Help ▾

Sign In My Activity ▾ Post A Property

Your Happy Home Journey BEGINS HERE

Coming Soon... CLASSIFIED WORLD

classifiedworld.net



টান্গাইলের সন্তোষে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র মাজার শরীফ।

একদিনের দেখা

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকতো হুজুরের মাজার জিয়ারত, যাদুঘর প্রদর্শন, আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুটির শিল্প প্রদর্শনী, বাউল আর মারফতি গান। অনুষ্ঠানগুলো দেখে পুরো সন্তোষে উৎসবমুখর পরিবেশ পরিলক্ষিত হলেও সবার মধ্যে হুজুর ভাসানীর শূণ্যতা ছিলো লক্ষ্যনীয়।

সুদূর প্রবাসে আজো দেখতে পাই শত্রুমণ্ডিত সেই 'মুখ'। যাঁর আদর্শের কথা আজো কানে বাঁজে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম মওলানা ভাসানী। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ মওলানা ভাসানী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে উপ-মহাদেশের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের তাঁর আদর্শকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলেই আমরা আমাদের অস্তিত্ব লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো। যেকোন আধিপত্যবাদী শক্তিকে রুখতে মওলানা ভাসানী প্রদর্শিত পথই আমাদের পাথেয়। তাঁর আদর্শের পথেই অপশক্তির অশুভ ইচ্ছাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবো।

বলতে দ্বিধা নেই শুধু বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয়, ভারত উপমহাদেশ তথা বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানীর মতো রাজনৈতিক নেতার বড় প্রয়োজন। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়া সময়ের দাবী। তাঁর আদর্শ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উজ্জ্বল করবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কেনো যেনো দেশের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও দল মওলানাকে ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে! তাঁকে আড়াল করতে চাচ্ছেন নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে। তারপরও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই মওলানা ভাসানী হুজুর বেঁচে থাকবেন যুগ যুগ। বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্ম আর আদর্শের জন্য। লেখাটির সমাপ্তি টানতে হৃদয়ে বাজছে ১৭ নভেম্বর সন্তোষে উঠা সেই শ্লোগান 'যুগ যুগ জিয়ো তুমি, মওলানা ভাসানী, মওলানা ভাসানী'।

লেখক : সম্পাদক, হককথা.কম/ইউএনএ, আজকের টেলিগ্রাম, নিউইয়র্ক। সাবেক সাধারণ সম্পাদক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টান্গাইল প্রেসক্লাব।

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মিজানুর রহমান খান আপেল



আমৃত্যু গণমানুষের কল্যাণে যে মানুষটি সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন তার নাম আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, যার জন্ম হয়েছিল ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে। তার পিতা হাজী শারাগাত আলী ও মাতা বেগম শারাগাত আলী। তাদের চার সন্তানের মধ্যে আব্দুল হামিদ খান সবার ছোট। শৈশবে পিতামাতা হারানো ছেলেটিই জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে হয়ে উঠেন এক সংগ্রামী নেতা, যার কারণে তাকে তার ভক্তরা 'মজলুম জননেতা' বলে সম্বোধন করতেন। ছোট বয়সেই পিতামাতা হারানো আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রাতিষ্ঠানিক পড়া-লেখার কড়াকড়ি অপছন্দের কারণে অল্প কিছুকাল স্কুল ও মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেছেন। ১৯০৭ সাল থেকে দু'বছর তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করলেও সেখানে বিদ্যাশিক্ষার তালিম না নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনায় বেশি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর সাদামাঠা জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন ঐতিহ্যবাহী জেলা টান্গাইলের সন্তোষে এক অতি সাধারণ ঘরে। প্রথমত তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত ছিল মূলত: বাংলা ও আসামের কৃষকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, তারপর তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯১৭ সালে জাতীয়তাবাদী দলে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হওয়ার পর তিনি প্রথমবারের মত কিছুদিনের জন্য কারাবাস করেছিলেন, যখন

অনেক খ্যাতিনামা রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার মধ্যেও তিনি টান্গাইলের একটি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর থেকে, আজীবন তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর চাওয়া ছিল শুধুই অসাম্প্রদায়িক এক সমাজ ব্যবস্থা, পারস্পরিক অধিকার ও জনগণের মুক্তি। তাই তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেবার পক্ষে ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর উদ্যোগেই 'মুসলিম' শব্দটি বাদ পরে। মওলানা ভাসানী নিজে একজন মওলানা ও হকপন্থী পীর ছিলেন। তাই, তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ রাষ্ট্রের চরিত্রে, মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে এক উজ্জল নক্ষত্র। যার কারণে পঞ্চাশের দশকেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হবে একটি অচল রাষ্ট্রকাঠামো। ১৯৬৮ সালে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল সকল পেশাজীবী ও নিম্ন-আয়ের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেই ছাত্র অসন্তোষ গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে। ১৯৭০ সালের ২৩ নভেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ঘোষণা দেন, যার পর শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তি

সংগ্রাম। ঐসময় তিনি ভারতে নজর বন্দী থাকার পর চলে আসেন স্বাধীন বাংলায় এবং এসে একটি গঠনমূলক বিরোধী রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন প্রতিবেশী দেশ ভারত যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ওপর কিছু কিছু শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, তখন তিনি তারও প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি সৌহারদের ভিত্তিতে ভারতকে প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভারত যখন তার স্বার্থে ফারাক্কা বাঁধ দিল তখন বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হলো।

এই মহান নেতা সারা জীবন অধিকার বঞ্চিত মেহনতী মানুষের কল্যাণার্থে যে আন্দোলনগুলো গড়ে তুলেছিলেন তা হলো খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফারাক্কা লং মার্চ। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর এই বরেন্দ্র নেতা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা দেশ থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ তার জানাজার অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় টান্গাইল জেলার সদর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে সন্তোষ পীর শাহজামান দীঘির পাশে। মৃত্যু পরবর্তী ১৯৭৭ সনে তিনি স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। কিংবদন্তী এ মহান সংগ্রামী নেতার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমিন

লেখক: কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট। কুইন্স ভিলেজ, নিউইয়র্ক

গ্রাম-গ্রামে
পথে-প্রান্তরে
খবরের ভিতরে

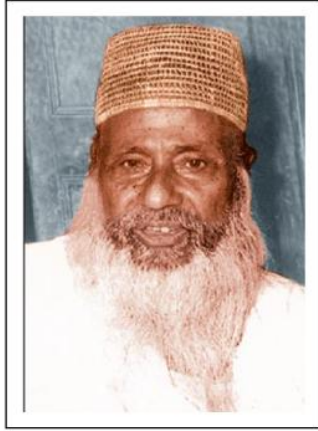
জানতে, জানাতে
টান্গাইল ২৪.কম
tangail24.com

মওলানা ভাসানীর ১৯৭০ এর নির্বাচন বর্জন ছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত

আতিকুর রহমান সালু

মূল কথায় যাওয়ার পূর্বে মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। টাংগাইল জেলার সন্তোষ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কাগমারীতে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী ৮, ৯ ও ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলন ডাকা হয়েছিল “শিক্ষা ও সংস্কৃতিক” সম্মেলনের নামে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উক্ত সম্মেলন এতদঞ্চলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মোচনে রাখে এক অসাধারণ ভূমিকা। এই সম্মেলনেই ইতিহাসে ‘ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন’ নামে খ্যাত। উক্ত সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত আতাউর রহমান ও শেখ মুজিবুর রহমান সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাংসদ, মন্ত্রী এবং দেশ-বিদেশের বরেন্দ্র ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, কবি, শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সহ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। আমার মরহুম পিতা নুরুল রহমান খান ইউসুফজাই ছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের বঙ্গীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদের সদস্য ও মওলানা ভাসানীর পুষ্টপোষক। যিনি বরাবরই মওলানা ভাসানীর দেশ প্রেমের প্রশংসা করতেন। সম্মেলনের দিন পিতার হাত ধরে সেই সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ হয়। সে এক হৈ-হৈ কাভ ও রৈ-রৈ ব্যাপার। সম্মেলনে আগমনের পথে পথে নির্মিত হয় অসংখ্য তোড়ন। মওলানা মোহাম্মদ আলী তোড়ন, মওলানা শওকত আলী তোড়ন, মহাত্মা গান্ধীতোড়ন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তোড়ন, শহীদ তীতুমীর তোড়ন সহ অসংখ্য তোড়ন। এছাড়া ছিল অসংখ্য দোকান পাট, চুড়ি, শাড়ী, লুঙ্গী, গামছা, চায়ের স্টল ও খাবারের দোকান। এই সম্মেলনে বিশাল-বিশাল ডেকাটা করে চাল-ডাল। গোস্ব ও শবজী দিয়ে রানড়বা হত সুস্বাদু খিচুরী। যা হুজুর ভাসানীর খিচুরী নামে এখনও বিখ্যাত। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে এত তোড়ন তার মধ্যে হুজুর ভাসানীর নামে কোন তোড়ন ছিলনা। কারণ হুজুরের নিষেধ ছিল তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নামে কোন তোড়ন নির্মান করা যাবেনা। ভারতের ধুবরি, আসাম, ভাসান চরে, টাঙ্গাইলের সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়, বগুরার মহীপুর, পাঁচবিবিত্তে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যত মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কোনটিতেই তিনি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার করেননি। যথার্থ

অর্থেই তিনি ছিলেন নির্লোভ ও দুর্লভ এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ১৯৫৭ সালে টাংগাইলের যাতায়াত ব্যবস্থা উনড়বত ছিলনা। ছিলনা কোন ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা। সেই অবস্থায় কাগমারীর মত অজপাড়াগায়ে এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করা সহজ সাধ্য ছিলনা। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন করে হুজুর ভাসানী সেই অসাধ্য সাধনই করেছেন। এই সম্মেলনেই তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মানুষের উপর, শোষণ, জুলুম ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বর্বর শাসক গোষ্ঠিকে বলেছিলেন ‘আসসালামোআলাইকুম’। সেই বক্তৃতা এখনও কানে বাজে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিজাতীয় শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের জন সভায় বলেন, ‘অনেক সংগ্রাম-আন্দোলন করে ও রক্ত দিয়ে বৃটিশকে তাড়িয়ে যে পাকিস্তান আমরা আনলাম তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই অঞ্চলের মানুষ তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে, পাবে অর্থনৈতিক মুক্তি, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের এই অঞ্চলের মানুষকে তোমরা শায়ত্ব-শাসন দেয়া তো দুইয়ের কথা ১৯৫২ সালে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষার উপর আত্মন করলা, ছাত্র-পাবলিক হত্যা করলা। ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েও মন্ত্রীসভা গঠন করার পরপরই ৯২ ‘ক’ ধারা জারী করে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিলা। আমাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার এইভাবে যদি ক্ষুণ্ণ করলে থাক এবং এই শোষণ-জুলুম ও বৈহীনসাক্ষী কাজ কারবার যদি চলতে থাকে তবে জেনে রাখ আমি তোমাদের ‘আসসালামোআলাইকুম’ দিতে বাধ্য হব। সে ছিল এক অসাধারণ বক্তৃতা। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের ঘৃণীকরে দক্ষিণাঞ্চলে ১৫ লক্ষ আদম সন্তানের মৃত্যু হয়। হুজুর মৃত্যুশয্যা থেকে পরম করনামায়ের অশেষ কৃপায় কিছুটা সুস্থ হয়ে ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা সফর করেন। ঐ সফরে আমিও তার সাথে ছিলাম। পাকিস্তানী জাম্ভারা আগে ভাগে কোন সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান



করে নাই। ঝড়ের পরেও দেখতে কেউ আসে নাই। হুজুর উপদ্রুত এলাকা সফর করে ১৯৭০ এর ৪ঠা ডিসেম্বর আবার ঐতিহাসিক পপ্টন ময়দানে করেন এক বিশাল জনসভা। সেই জনসভায় মওলানা ভাসানী তার বক্তৃতায় পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘১৯৫৭ সালে আজ থেকে ১৩ বছর পূর্বে কাগমারী সম্মেলনে আমি বলেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি তোমাদের শোষণ, জুলুম ও বৈহীনসাক্ষী কার্যকলাপ বন্ধ না হলে আমি ‘আসসালামোআলাইকুম’ দিতে বাধ্য হব। সর্বনাশা ঝরে লক্ষ-লক্ষ লোক মরলো, তোমরা কেউ দেখতে আসলে না। ঝড়ের আগাম খবর দিলা না। গাছের ডালে, ঘরের চালে, ক্ষেতে খামারে দেখে আসলাম শুধু লাশ আর লাশ ও শতশত মৃত গবাদী পশু। মানুষের ঘর-বাড়ী নাই ঝড়ে সবশেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আজ আমি চূড়ান্ত ভাবে তোমাদের জানাচ্ছি ‘আসসালামোআলাইকুম’। বলছি ‘লাকুম স্বীনওকুম অলিয়াদীন’- তোমাদের সঙ্গে আর আমাদের সমাজ জামাত করা যাবেনা। এরপর তিনি বলেন, ‘আজ তাই একদফা, স্বাধীনতার দফা আমি উত্থাপন করছি। এই বক্তৃতা আমার মতে হুজুর ভাসানীর সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। আমি সেদিন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলাম। দেখি পাশেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রখ্যাত কবি প্রয়াত শামসুর রাহমান বক্তৃতা শুনেছেন। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শুনে জনসভায় উপস্থিত অনেককেই হুঁ-হুঁ করে কাঁদতে দেখেছি। এই বক্তৃতা শুনেই কবি শামসুর রাহমান লেখেন, হুজুরকে নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ‘সফেদ পাঞ্জাবী’ কবিতা। ১৯৬৯ সনের ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের কথা সর্বজন বিদিত। সেই সভায় আগরতলা ঘরযন্ত্র মামলায় বন্দী শেখ মুজিবকে মুক্ত করার জন্যে পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতিখোষ ঘোষনা এখনও কানে বাজে। অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে জেলের তাল ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করা হবে। এই ঘোষনার পরপরই শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচন মওলানা ভাসানী বর্জন করেন। তিনি জেনে-বুঝেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি

তখন সংকল্পবদ্ধ ছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্যে। তিনি জানতেন, নির্বাচনে ভাসানী ন্যাপ, ২০/৫০টি সিট পেলে আর পাকিস্তান ভাঙ্গা সহজ হবে না। অনেক সাহস নিয়ে আমি সেদিন তাঁকে প্রশংসা করেছিলাম হুজুর আওয়ামীলীগকে ‘ব্র্যাং’ চেক দিলেন। হুজুর একটু রাগত ভাবে বলেন, ‘বেশী বোঝ, পরক্ষণেই মৃদুহেসে বলেন, ‘তোমরা না দেশ স্বাধীন করবা, বিপ্লব করবা, যাও কাজ কর, কাজ কর, এখন কাজের সময়।’ আমি এখনও ভেবে অবাক হই যে, মওলানা ভাসানী জেনে বুঝেই পাকিস্তান ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েই নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষ যাতে স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আঙুয়ান হয় এই জন্যেই কৌশলী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কি যথার্থ অর্থেই ভবিষ্যত দ্রষ্টা ছিলেন?। দলকানা ও অর্বাচীন যারা তারা অনেক সময় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও জিয়ার তুলনা করতে উদ্যত হয়। ইতিহাসের সত্য এই যে, শত বৈরীতা স্বত্বেও ভাসানী-মুজিবের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের। আর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ও তার উপস্থিতিতেই টাংগাইলের সন্তোষে রাস্তায় রাস্তায় স্বাধীনতার স্বপ্নবদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্বেচ্ছবহন্য হিসেবে এবং তাঁকে কাছ থেকে দেখার যে সৌভাগ্য হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলবো যে, ভাসানীর তুলনা ভাসানী নিজেই। মরেও তিনি অমর তার কর্মে। মৃত ভাসানীর চেয়ে জীবিত ভাসানী অনেক বেশী শক্তিশালী। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বে ১৯৭৬ এর ১৬ই মে ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। দেয় উৎসাহ উদ্দীপনা। মাথা উঁচু করে কি করে বাঁচতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মওলানা ভাসানী তাই যুগে যুগে জোগাবে শক্তি-সাহস ও অনুপ্রেরণা।

অনলাইনে
হক কথা পড়তে
ক্লিক করুন-
www.hakkatha.com

CLASSIFIED WORLD
Buy Rent Sell Tools & Advice What's New Property Services Blog Help
Sign In My Activity Post A Property

CLASSIFIED WORLD
Maximum Options For Every Type of Property At one address Coming Soon... classifiedworld.net

* condition apply.

প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়

অথচ যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী এদেশে প্রবাসী তথা অভিবাসীদের রাজনীতি করার কোন সুযোগ নেই। তারপরও বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবে, ভিন্ন কৌশলে এদেশে রাজনীতি চলছে, সভা-সমাবেশ হচ্ছে, পক্ষে-বিপক্ষে রাজপথে বিক্ষোভ আর শ্লোগান পাঁটা শ্লোগান হচ্ছে। তাও আবার দেশী কায়দার নোংরা রাজনীতি।

৫২'র ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ আর স্মরণীয় বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজ দেশের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মধ্যে অনুপস্থিত। সত্যিকারের ‘গণতন্ত্র’, ‘গণতান্ত্রিক আন্দোলন’ বলতে যা বুঝায় তা আজ দেশ-বিদেশের রাজনীতিতে কোথায়? কোথায় সেই রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক সহনশীলতা, ধৈর্য, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা, সন্মান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেমন যোগ্য নেতৃবৃন্দের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রদ্ধাবোধের অভাব তেমনি রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষারও বড় অভাব লক্ষ্যণীয়। অথচ গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল ও প্রথম শর্ত হচ্ছে ধৈর্য, সহনশীলতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে যে, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ রফিকুল ইসলামের রহমানসহ দেশের জনপ্রিয় সকল নেতৃবৃন্দ কোন না কোনভাবে অসম্মানিত হয়েছেন, অসম্মানিত হচ্ছেন। এমন কি দেশের দুই প্রধান এবং জনপ্রিয় দল বিএনপি চেয়ারপার্সন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকেও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত করা হয়েছে, অসম্মানিত করা হয়েছে, করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদেরকে অসম্মানিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কে বড়, কে ছোট, কার কি অবদান তা নিয়ে বিতর্কেও কোন অবকাশ নেই। ইতিহাস এবং সময়ই সব বলে দেবে, সত্য সব সময়ই সত্য। আমাদের প্রয়োজন শুধু ধৈর্য, সহনশীলতা, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির অব্যাহত চর্চা, অনুশীলন আর প্রয়োগ। আর এটা প্রয়োজন আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যায়, দেশে কি প্রবাসেও।

সর্বশেষ এই প্রবাসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিজয় দিবসের সমাবেশে ‘হাতাহাতি-মারামারী’র যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আশাহত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত সকল প্রবাসী, ব্যথিত হয়েছেন গণতন্ত্রমনা সকল মানুষ।

এই প্রবাসে আওয়ামী লীগ-বিএনপি’র সভা-সমাবেশেও ঘটেছে অনেক অঘটন, ঘটেছে অনেক ন্যাকারজনক ঘটনা। নিউইয়র্ক সফরকালে আওয়ামী লীগের সমাবেশে অপমান-অপদস্ত হয়েছেন দলের সিনিয়র নেতা, সাবেক মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ (মরহুম), বিএনপি’র সমাবেশে অপমানিত হয়েছেন দলের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব, সাবেক মন্ত্রী অধ্যাপক বদরুজ্জোজা চৌধুরী (পরবর্তীতে দেশের রাষ্ট্রপতি)। এছাড়াও আরো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাবেশে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অপমানিত, অপদস্ত, অসম্মানিত হয়েছেন। তাতে এই প্রবাসে

কলংকিত হয়েছে আমাদের মান-মর্যাদা, আমরা হারিয়েছি আমাদের সেই অহংকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আচার-আচরণ যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে আমরা পেয়েছি মাতৃভাষা বাংলা আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। (প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক হককথা’র প্রথম সংখ্যায় (০১ জানুয়ারী ২০০৬) প্রধান প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত। -সম্পাদক)

‘হক কথা ও ইউএনএ’

অবিস্মরণীয় নাম। দেশের জনগণের কাছে তিনি এক বিস্ময়কর ইতিহাস এবং স্বাধীন বাংলাদেশ’র স্বপ্নদ্রষ্টা। উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মওলানা ভাসানী ছিলেন এক মহিরুহ ব্যক্তিত্ব। মওলানা ভাসানী ছিলেন সকল প্রকার শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচার আর প্রতিবাদের প্রতীক। তিনি ছিলেন একাধারে মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদী ও পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী নেতা। সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি অসাম্প্রদায়িক মানুষ। যে কারণে দল-মত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে মওলানা ভাসানী একজন ‘মুকুটহীন সম্রাট’। মওলানা ভাসানীর পাশাপাশি আমরা আরো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ রফিকুল ইসলামের রহমানসহ সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের যাদের আত্মত্যাগ আর অবদানের ফসল আজকের স্বাধীন, সার্বভৌম, আধুনিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূচনা বিকাশে মওলানা ভাসানীর বিচক্ষণতা ও সাহস সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলো। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও আঙ্গনা সংগ্রামী ইতিহাস আজো দেশের মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

বাংলাদেশের জনগণ আজ দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী আর শোষণ-শাসকদের দ্বারা শোষিত এবং নির্যাতিত। দেশ আজ দুঃসময় অতিক্রম করছে। দেশের এই দুঃসময় ও চলমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমরা মওলানা ভাসানী’র মতো একজন মহান দেশপ্রেমিক নেতার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করছি। আর এই অনুভব থেকেই আমরা মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ‘হক-কথা’ পত্রিকা’র নামানুসারে এই প্রবাস থেকে ‘হক কথা’ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ‘হক-কথা’র নাম আজো দেশবাসী’র কাছে স্মরণীয়। দেশ-জাতিকে সঠিক পথ আর দিক নির্দেশনা দিতে ‘হক-কথা’র ভূমিকা ও অবদান নিঃসন্দেহে অনুস্মরণীয় এবং অনুকরণীয়। আজ মওলানা ভাসানী জীবিত নেই, নেই তার ‘হক-কথা’। কিন্তু আমাদের সামনে রয়েছে মওলানা ভাসানী’র আদর্শ ও ‘হক-কথা’র দৃষ্টান্ত।

দেশ-বিদেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানী’র ‘হক-কথা’র বড় প্রয়োজন। মওলানা’র হক কথা-কে সামনে রেখে রাজনৈতিক সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা এবং ঐক্যবদ্ধ রেখে দেশ-জাতি আর কমিউনিস্টকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে চায় আমাদের ‘হক কথা’। তাছাড়া আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে মওলানা ভাসানী’র দীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস অজানা। দেশ-বিদেশের সকল বাংলাদেশী মেহনতি, দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রমনা

জনগণের মুখপত্র হিসেবে প্রবাসে অবদান রাখতে চায় ‘হক কথা’। তাছাড়া উত্তর আমেরিকায় সং ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

‘হক কথা’র যাত্রাপথে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৫২’র ভাষা আন্দোলন আর ৭১’র মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদ আর সকল বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদসহ সর্বস্তরের মানুষকে যাদের চরম ত্যাগ ও অবদানের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ‘বাংলা’-কে মাতৃভাষা হিসেবে আর পেয়েছি লাল-সবুজে ঘেরা জাতীয় পতাকার স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি প্রশ্ন? কমিউনিটির নিয়মিত ১২টি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ভেঁড়ে আবার কেন নতুন পত্রিকা ‘হক কথা’র আত্মপ্রকাশ। এ বিষয়ে আমরা আপাতত: কোন মন্তব্য না করে শুধু এটুকুই বলতে চাই আগামী দিনগুলোতে চলার পথে ‘হক কথা’ই বলে দেবে কেন ‘হক কথা’র আত্মপ্রকাশ। কমিউনিটির অন্য সকল পত্রিকাগুলোর সাথে ‘হক কথা’ও এক সহযাত্রী। ‘হক কথা’র যাত্রা পথে মহান আল্লাহতায়ালার অসীম রহমত এবং পত্রিকাটি’র অভিস্ট লক্ষ্য অর্জনে আমরা দলমত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

Abdul Bhashani

spent a total of 28 years in jail, was in politics for more than 60 years but showed little interest in gaining office or writing constitutions.. He sought, rather, the transformation of the unrest in Pakistan into a class struggle between the haves and the have-nots. In 1969, speaking of elections that had been promised by the Government, he warned that polling booths would be burned.

He told an interviewer that he was not interested in elections because he wanted to press on with “the cause of the common people.” The common people, he asserted, get nothing out of elections because poor men can never afford to run for office.

The Maulana said that he took his socialism from the Koran.

“Islam says whatever is beneath the sky or over the surface of the earth belongs to Allah,” he said. “I want to put that:concept in practice. I want everything nationalized in the name of Allah and distributed equally to the people.”

Declaring that agents of the United States Central Intelligence Agency had spread what lie termed the slander that he was a Communist, he said that he resented it because it suggested that he was “a godless man.”

But Mr. Bhashani made no apology for his allegiance to Communist China, heightened during a visit to Peking in 1952. He said, “I admire everything about China except its godlessness.”

দল নয় নীতিতেই ছিলেন অটল

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সংগঠনবিরোধী বলে যে অপখ্যাতি অর্জন করেছিলেন - তার সমর্থকও অসমর্থক অনেকেই দ্বারা। তা মোটেই যথার্থ নয়। তার প্রতিপক্ষের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন। “আমার বিরুদ্ধবাদীরা



সৈয়দ টিপু সুলতান

এমনকি রাজনীতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন না এই রূপ সরল ব্যক্তিরও বলিয়া থাকেন ভাসানী বারবার দল পরিবর্তন আর দল ত্যাগ করেন। কিন্তু আমার সমালোচক বন্ধুরা বোধ হয় একটি বারও ধীরভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ভাসানীর সত্যিকারের নীতি কী? একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের বুঝিতে মোটেই কষ্ট হইত না যে, ভাসানী নীতির স্বার্থে বারবার দল ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে একটি বারও নীতি ত্যাগ করে নাই।”

ভাসানী ছিলেন একাধারে জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী ও আন্তর্জাতিকবাদী। চীনের সান ইয়াং সেন (১৮৬৬-১৯২৫) ও মওলানা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। মহান বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জননেতা ছিলেন। সান সর্বদা ক্ষমতায় না থেকেও যেমন চীনে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের জাগরণ আনেন তেমনি মওলানা ভাসানীও ব্রিটিশ ভারতে, বাংলা-আসামে, পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। উভয়েরই লক্ষ্য ছিলো অভিনব জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং সকল বিদেশী শোষণের অবসান। সান-এর সৌভাগ্য তিনি পেয়েছিলেন তার দেশে মাও সে-তুং এর মতো একজন উত্তরসূরি। কিন্তু ভাসানীর দুর্ভাগ্য এক্ষেত্রে। তাঁর জীবনের শেষ চার দশকে তিনি দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নায়ক অথবা অন্যতম নায়কের ভূমিকা পালন করেন। এই বিরল কৃতিত্ব তাঁর সমসাময়িক আর কোন বাঙ্গালীনেতা আইন করতে পারেন নি। মওলানা ভাসানীর শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষাদর্শনের যেমন মিল রয়েছে। তেমনি রাজনৈতিক দর্শনের রয়েছে গরমিল। বিশৃঙ্খলতা এবং আহমেদাবাদের গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দুই মানব সন্তান ভাসানীকে হয়তো অনুপ্রাণিত করেছিলো সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে। কিন্তু অন্যদিকে মওলানা গান্ধীর সমালোচনা করে বলেন। “আমি তথাকথিত অহিংসায় বিশ্বাস করি না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের অহিংসার নীতি অচল। অহিংসায় মজলুমের কোন উপকার হয় না, লাভবান হয় জুলুমকারী।”

মওলানা কমিউনিস্ট ছিলেন না। মার্কস বাদী ও ছিলেন না। কিন্তু ছিলেন সমাজতন্ত্রের একজন অবিচল প্রবক্তা। মার্কসবাদী না হয়ে ও মার্কসের হান্দিব বস্তুবাদ না পড়াশুনা করে ও হান্দিব বস্তুবাদের মূল নীতি তিনি প্রকৃতিগত ভাবে অনুসরণ করেছেন। জীবন দর্শনের বিভিন্নদিক গ্রন্থিতে বিচরন করতে গিয়ে সমাজ বিবর্তনের নানান দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে থিসিস, এন্টিথিসিস, সিনথেসিস এর অমোঘ পরিমাণ নিজে

ও সমাজকে নিয়োজিত করেছেন। বড় মাপের একজন দার্শনিকের শুধু থিউরি নয় বাস্তবতার নিরিখে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর তাই শ্রেনী সংগ্রাম সংগঠিত করার লক্ষ্যে

গঠন করেছেন পাট চাষী সমিতি, মৎসজীবী সমিতি, রিক্সচালক সমিতি। শ্রমিক সমিতি, তাঁতী সমিতি, কর্মকার সমিতি, কৃষক সমিতি। কার্ল মার্কস বলেছেন কৃষি প্রধান দেশে কৃষকদের সমর্থন ছাড়া বিপ্লব সফল হতে পারে না। তাই ভাসানী কেবল তার আত্মউপলব্ধি থেকে জীবনের শেষ ৫০ বছর আসামের বরপেটায়, ময়মনসিংহে, টাঙ্গাইলে, সিরাজগঞ্জেও, পাবনায়, পাকসিতে, নওগাতে, মহিপুরে, ঢাকায়, শিবপুরে, ভুরুঙ্গামারিতে প্রভৃতি স্থানে বিশাল বিশাল কৃষক সম্মেলন করেছেন।

ভায়েলেন্স ছাড়া পৃথিবীতে কোথায় ও মুক্তি আসে নি। রক্তক্ষরণ ছাড়া কোথায়ও স্বাধীনতা অর্জন হয়নি। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও রক্তপাত ছাড়া হয় নি। ভাসানীর ভায়েলেন্স সহ সঠিক পদক্ষেপেই লৌহ মানব আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। সাপ্তাহিক টাইম লিখেছিল একজন শুধু একজন মানুষই গত মাসে (মার্চ ১৯৬৯) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং লৌহমানব নামে খ্যাত আইয়ুব খানকে গদ্যচ্যুত করতে বাধ্য করেছেন। এই মুহুর্তে ভাসানীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভৌগলিকতাকে বিভক্ত। গোলযোগপূর্ণ দেশে সামরিক আইন দিয়ে ভঙ্গুর শান্তি ফিরিয়ে আনলে ও তিনিই এখন সেই সামরিক আইনের একমাত্র একক আতংকস্বরূপ। ব্রিটিশ আমলে ভাসানীর চরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে যে মহামানবের যাত্রা শুরু

; ফারাক্ষা মিছিলের ভিতর দিয়ে যে মনিষী কেবলই এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। যার সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপের ফলে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে, অমোঘ মৃত্যু ও তাঁর কালের যাত্রা, আদর্শের যাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারে না।

মওলানা ভাসানী ছিলেন নিপীড়িত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত, অবহেলিত জনগণের নির্ভীক কণ্ঠস্বর। বিবেকের বাণী, ভবিষ্যতের নির্ভুল দ্রষ্টা। ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্মহীন নন। অসম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আস্থাবান। আসামে বন কেটে বসতিস্থাপনকারী মেহনতি মানুষের অধিকার সংগ্রাম যাকে নিপীড়িত মানুষের মুকুটহীন সম্রাটের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁহার মৃত্যু নাই, তিনি চিরজীব। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বদনমুক্ত। সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি দল বদল করেছেন কিন্তু নীতি বদল করেন নি। দল যখন নীতিতে অটল থাকেনি তখন তিনি নীতিতে অটল থেকে দল বদল করেছেন।

তথ্যসূত্র : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী - সৈয়দ আবুল মাকসুদ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী স্মারক-সংকলন

ভাসানী সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের

মওলানা ভাসানী'র জীবনী

প্রথম পাতার পর

মাওলানা ভাসানী নামে পরিচিত, ছিলেন বিংশশতকী ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ ও গণআন্দোলনের নায়ক, যিনি জীবদ্দশায় ১৯৪৭-এ সৃষ্ট পাকিস্তান ও ১৯৭১-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষের কাছে ‘মজলুম জননেতা’ হিসাবে সমধিক পরিচিত। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী প্রধান নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তিনি মাওপন্থী কমুনিষ্ট, তথা বামধারার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তার অনুসারীদের অনেকে এজন্য তাকে ‘লাল মওলানা’ নামেও ডাকতেন। তিনি কৃষকদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষক পাটির করা জন্য সারাদেশ ব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা এবং পঞ্চাশের দশকেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি অচল রক্টকাঠামো। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের কাগমারী সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের ‘আসসালামুআলাইকুম’ বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন।

জীবনী (১৮৮০-১৯২৯) : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ধানগড়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাজী শারায়ফ আলী। হাজী শারায়ফ আলী ও বেগম শারায়ফ আলীর পরিবারে ৪ টি সন্তানের জন্ম হয়। একটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে। মোঃ আব্দুল হামিদ খান সবার ছোট। তার ডাক নাম ছিল চোগা মিয়া। ছেলে-মেয়ে বেশ ছোট থাকা অবস্থায় হাজী শারায়ফ আলী মারা যান। কিছুদিন পর এক মহামারীতে বেগম শারায়ফ ও দুই ছেলে মারা যায়। বঁচে থাকেন ছোট শিশু আব্দুল হামিদ খান। পিতৃহীন হামিদ প্রথমে কিছুদিন চাচা ইব্রাহিমের আশ্রয়ে থাকেন। ওই সময় ইরাকের এক আলেম ও ধর্ম প্রচারক নাসির উদ্দীন বোগদাদী সিরাজগঞ্জে আসেন। হামিদ তার আশ্রয়ে কিছুদিন কাটান। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে ১৮৯৩ সালে তিনি জপুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর বাড়িতে যান। সেখানে তিনি মাদ্রাসার মোদাররেসের কাজ করেন এবং জমিদারের ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্ব নেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পীর সৈয়দ নাসীরুদ্দীনের সাথে আসাম গমন করেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ইসলামিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০৭-এ দেওবন্দ যান। দুই বছর সেখানে অধ্যয়ন করে আসামে ফিরে আসেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহ সফরে গেলে তার ভাষণ শুনে ভাসানী অণুপ্রাণিত হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পাটি গঠন করলে ভাসানী সেই দল সংগঠিত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন মহম্মদ চৌধুরীর মেয়ে আলোমা খাতুনকে বিবাহ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি তার সহধর্মিণী আলোমা খাতুনকে নিয়ে আসাম গমন করেন এবং আসামে প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ১৯২৯-এ আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন আয়োজন করেন। এখান থেকে তার নাম রাখা হয় ‘ভাসানীর মাওলানা’। এরপর থেকে তার নামের শেষে ভাসানী

শব্দ যুক্ত হয়।

জীবনী (১৯৩০-১৯৫৯) : ১৯৩১-এ সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২-এ সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় ও ১৯৩৩-এ গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন। ১৯৩৭-এ মওলানা ভাসানী কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। সেই সময়ে আসামে ‘লাইন প্রথা’ চালু হলে এই নিপীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। এসময় তিনি ‘আসাম চাষী মজুর সমিতি’ গঠন করেন এবং ধুবরী, গোয়ালপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৯৪০ সালে শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে মাওলানা ভাসানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালীদের বিরুদ্ধে ‘বাঙ্গাল খেদাও’ আন্দোলন শুরু হলে ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দেয়। এসময় বাঙালীদের রক্ষার জন্য ভাসানী বারপেটা, গৌহাটি সহ আসামের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়ান। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়ে ১৯৪৭ সালে আসামে গ্রেফতার হন। ১৯৪৮-এ মুক্তি পান। এরপর তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে ফিরে আসেন।

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ ব্যবস্থাপক সভার কার্যাবলি বাংলায় পরিচালনা করার জন্য স্পিকারের কাছে দাবি জানান এবং এই দাবি নিয়ে পীড়াপীড়ি করেন। ১৯ মার্চ বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে বলেন, যেসব কর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ প্রদেশ থেকে সংগ্রহ করে তার শতকরা ৭৫% প্রদেশকে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ আমলে বঙ্গপ্রদেশ জুটেক্স ও সেলসট্যাক্স রাজস্ব হিসেবে আদায় করত এবং এই করের ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হতো না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ সরকারের হাত থেকে এই কর হিনিয়ে নিয়ে নিজেরাই আদায় করতে থাকে যার ফলে পূর্ববঙ্গ সরকার আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বয়ের ব্যাপার হলো এই সময় পূর্ববঙ্গ সরকারের বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ৩৬ কোটি টাকা। যাই হোক, মুসলিম লীগ দলের সদস্য হয়েও সরকারের সমালোচনা করায় মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন সদস্যরা মওলানা ভাসানীর ওপর অশুশী হয় এবং তার নির্বাচনে ত্রুটি ছিল এই অজুহাত দেখিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করে এবং মওলানা ভাসানীকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। পরিশেষে মওলানা ভাসানী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এতদসত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্নর এক নির্বাহী আদেশ বলে মওলানা ভাসানীর নির্বাচন বাতিল করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জনবিরোধী কার্যকলাপের ফলে মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকার টিকাটুলিতে রোজ গার্ডনে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। ২৩ জুন ওই কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে প্রায় ৩০০ কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান। মওলানা ভাসানী ছিলেন প্রধান অতিথি। ২৩ জুন পূর্ববঙ্গেও প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা ভাসানী সর্বসম্মতিক্রমে এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শামসুল হক এবং যৌথভাবে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক। ২৪ জুন

আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১১ অক্টোবর আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় খাদ্য সমস্যা সমাধানে বার্থতার জন্য পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবী করা হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মওলানা ভাসানী ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৯৪৯-এর ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবরণ করেন। ১৯৫০ সালে সরকার কর্তৃক রাজশাহী কারাগারের খাপরা ওয়ার্ড এর বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন করেন এবং ১৯৫০ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রক্টভাষা করার দাবিতে ১৯৫২-র ৩০ জানুয়ারী ঢাকা জেলার বার লাইব্রেরি হলে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রক্টভাষা কর্মপরিসদ গঠিত হয়। রক্টভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার কারণে গ্রেফতার হয়ে ১৬ মাস কারানির্বাচনের শিকার হন। অবশ্য জনমতের চাপে ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল মওলানা ভাসানীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ৩ ডিসেম্বর কৃষক-শ্রমিক পাটির সভাপতি শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নামক নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে এবং পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে ২৩৭টির মধ্য ২২৮ টি আসন অর্জনের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর ২৫ মে ১৯৫৪ মওলানা ভাসানী বিশু শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে যান এবং সেখানে বক্তব্য প্রদান করেন। ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করে এবং মওলানা ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ১১ মাস লন্ডন, বার্লিন, দিল্লী ও কলকাতায় অবস্থান করার পর তার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলে ১৯৫৫-র ২৫ এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ব বাংলায় খাদ্যজনিত দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৫০ কোটি টাকা আদায়ের দাবিতে ১৯৫৬-র ৭ মে ঢাকায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার দাবি মেনে নিলে ২৪ মে অনশন ভঙ্গ করেন। একই বছর ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পাটির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে মাওলানা ভাসানী সরকারের পররক্টনীতির বিরোধিতা করে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করার জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। ১৯৫৬তে পাকিস্তান গণপরিষদে যে খসড়া শাসনতন্ত্র বিল পেশ করা হয় তাতে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, তখন মওলানা ভাসানী পল্টনের জনসভায় তার বিরোধিতা করে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছিলেন। কাগমারী সম্মেলনে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৮ ফেব্রুয়ারী ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়। এই সভায় মওলানা ভাসানীও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বলেন, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের দ্বারা শোষিত হতে থাকলে

পূর্ববঙ্গবাসী তাদের সালামু ওআলায়কুম জানাতে বাধ্য হবে। এছাড়া কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী সেই দাবি প্রত্যাখান করলে ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। একই বছর ২৫ জুলাই তার নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ‘ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি’ (ন্যাপ) গঠিত হয়। ন্যাপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাসানী প্রকাশ্যে বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং এর পর থেকে সবসময় বাম ধারার রাজনীতির সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৫৭-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি হলে আইয়ুব খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১২ অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে কুমুদিনী হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকায় ৪ বছর ১০ মাস কারারুদ্ধ থাকেন।

জীবনী (১৯৬০-১৯৬৯): বন্দী অবস্থায় ১৯৬২-র ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্যাদুর্গতদের সাহায্য ও পাটের ন্যায্যমূল্যসহ বিভিন্ন দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ৩ নভেম্বর মুক্তিলাভ করেন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হন। ১৯৬৩-র মার্চ মাসে আইয়ুব খানের সাথে সাক্ষাত করেন। একই বছর ২৪ সেপ্টেম্বর চীনের বিপ্লব দিবস-এর উৎসবে যোগদানের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন এবং চীনে সাত সপ্তাহ অবস্থান করেন। ১৯৬৪-র ২৯ ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পুনরুজ্জীবিত করে দলের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একই বছর ২১ জুলাই সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) গঠনে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫-র ১৭ জুলাই আইয়ুব খানের পররক্ট নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৬৬-তে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচীর বিরোধিতা করেন। ১৯৬৭-র ২২ জুন কেন্দ্রীয় সরকার রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ জারি করলে এর প্রতিবাদ করেন। ১৯৬৭-র নভেম্বর-এ ন্যাপ দ্বি-খণ্ডিত হলে চীনপন্থি ন্যাপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা ভাসানী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মুক্তি দাবি করেন। ৮ মার্চ (১৯৬৯) পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে সাক্ষাত করে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে একমত হন। ২৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান কর্তৃক আদৃত গোলটেবিল বৈঠক প্রত্যাখান করে শ্রমজীবীদের ঘেরাও কর্মসূচী পালনে উৎসাহ প্রদান করেন। আইয়ুব খান সরকারের পতনের পর নির্বাচনের পূর্বে ভোটের আগে ভাত চাই, ইসলামিক সমাজতন্ত্র কায়েম ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করেন।

আমেরিকান সাংবাদিক ড্যান কোগগিন, টাইমে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানকে উসকে দেওয়ার জন্য ভাসানীর প্রশংসা করেছিলেন যে, ‘যতটা একজন মানুষ মতো, যা আইয়ুব খান সরকারের পতনের ঘটিয়েছিল।

জীবনী (১৯৭০-১৯৭১): ১৯৭০ সালের ৬-৮ আগস্ট বন্যা সমস্যা সমাধানের দাবিতে অনশন পালন করেন। অতঃপর সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১২ নভেম্বর (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় হলে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ ব্যবস্থায় অংশ নেয়ার জন্য ন্যাপ প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান’ দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৭১ এর মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন এবং ১৮ জানুয়ারী ১৯৭১ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের জন্য তার প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত যান এবং মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। ২৫ মার্চ রাতে মওলানা ভাসানী সন্তোষে তার গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি পাকিস্তান বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে টাঙ্গাইল ছেড়ে তার পিতৃভূমি সিরাজগঞ্জে চলে যান। পাকিস্তান বাহিনী তার সন্তোষের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। মওলানা ভাসানী মোজাফফর ন্যাপ নেতা সাইফুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে ভারত সীমানা অভিমুখে রওনা হন। অবশেষে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর সাহায্যে মওলানা ভাসানী ও সাইফুল ইসলাম ১৫/১৬ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ অতিক্রম করে আসামের ফুলবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হন। পরে তাদের হলদীগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়া হয়। এরপর মওলানা ভাসানী ও সাইফুল ইসলামকে পুেনে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং পার্ক স্ট্রিটের কোহিনুর প্যালেসের ৫তলার একটি ফ্ল্যাট তাদের অবস্থানের জন্য দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে মওলানা ভাসানী একটি বিরূতি প্রদান করেন যা ভারতীয় বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া মওলানা ভাসানী চীনের নেতা মাও সে তুং, চৌ এন লাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে তার বার্তা পাঠিয়ে তাদের অবহিত করেন যে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাচ্ছে। সেজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিম্ননকে অনুরোধ করেন এই মর্মে যে, তিনি যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করেন। উপরন্তু মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট নিম্ননকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহবান জানান। ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী সেভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কাছে পাকিস্তান বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ৩১ মে মওলানা ভাসানী এক বিরূতিতে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বন্ধপরিকর। তারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করবেই। ৭ জুন মওলানা ভাসানী এক বিরূতিতে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দখলদার বাহিনীর সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বন্ধপরিকর। তারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করবেই। ৭ জুন মওলানা ভাসানী এক বিরূতিতে বলেন, বাংলাদেশের সব অঞ্চল আজ দশ লাখ বাঙালীর রক্তে স্নাত এবং এই রক্তস্রাবের মধ্য দিয়েই বাংলার স্বাধীনতা আসবে।

এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দু’বার কোহিনুর প্যালেসে এসে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং তার পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বদলীয় চরিত্র দেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে আট সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। ওই উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন- ১) তাজউদ্দীন আহমদ, ২) মণি সিংহ, ৩) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ৪) মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ওই উপদেষ্টা কমিটির সভায় এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেক অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণযোগ্য হবে না।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মওলানা ভাসানী কলকাতা ছাড়াও দেৱাদুন, দিল্লি ও অন্যান্য স্থানে অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে অনেকে অভিযোগ করেন যে ভারতে (পরবর্তী অংশ পৃষ্ঠা ১৫)

মওলানা ভাসানী’র জীবনী

১৪৩ম পাতার পর

থাকাকালীন তিনি নজরবন্দি অবস্থায় ছিলেন। ভারতে অবস্থানকালে মওলানা ভাসানী দুইবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাকে দিল্লি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে ভর্তি করা হয়েছিল।

জীবনী (১৯৭২-১৯৭৬):

মওলানা ভাসানী ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২-এর ২৫ ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক হক-কথা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীচুক্তির বিরোধিতা করলেও মুজিব সরকারের জাতীয়করণ নীতি এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন এবং মাওলানা ভাসানী বলেছিলেন, ‘আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।’

১৯৭৩ সালে খাদ্যের দাবিতে ঢাকায় ১৫-২২ মে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৭৪-এর ৮ এপ্রিল হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতি গঠন করেন। একই বছর জুন মাসে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে টাঙ্গাইলের সন্তোষে গৃহবন্দি হন। ১৯৭৬-এর ১৬ মে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক লং মার্চে নেতৃত্ব দেন। একই বছর ২ অক্টোবর খোদাই খিদমতগার নামে নতুন আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

পরিবার

১৯২৫ সালে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী জয়পুরহাটের

পাঁচবিবি উপজেলার জমিদার শামসুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীর মেয়ে আলোমা খাতুন ভাসানীকে বিবাহ করেন। যিনি (পীর মা হিসেবে খ্যাত) যিনি তার বাবা পাঁচবিবির জমিদার কর্তৃক পৈতৃক সুত্রে প্রাপ্ত সকল জমি মওলানা ভাসানীর জনকল্যাণমূলক কাজে (হুকুল এবাদ মিশন) এ দান করেন। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ২য় সহধর্মিণী হামিদা খানম ভাসানী ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার আদমদিঘি থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কাসেম উদ্দিন সরকার জমিদারশ্রেণীভুক্ত একজন সমাজ হিতৈষি ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। অত্র এলাকায় কৃষক সংগঠনের রেশ ধরেই মওলানা ভাসানীর সাথে তাঁর পরিচয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর (বাংলা ১৩ পৌষ), সোমবার সুবেহ সাদিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধীতে মৃত্যুবরণ করেন হামিদা খানম।

মৃত্যু

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মাজার

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই দেশ বরণ্য নেতা মৃত্যুবরণ করেন। তাকে টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে সন্তোষ নামক স্থানে পীর শাহজামান দীঘির পাশে সমাধিস্থ করা হয়। সারা দেশ থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করে।

সমাজ সংস্কার

রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। জয়পুরহাট-এর পাঁচবিবিতে মহিপুর হুকুল এবাদ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন যার অধীনে একটি মেডিকেল, টেকনিক্যাল স্কুল, হাজী মুহসিন কলেজ (প্রস্তাবিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন, পরে সেটি জাতীয়করণ করা হয়। আসামে ৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কারিগরী শিক্ষা কলেজ, শিশু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন সন্তোষে। এছাড়াও তিনি কাগমারিতে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ সন্তোষে (সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) যা কিনা ‘মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়’ ২০০২ সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান এ আছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ

দেশের সমস্যা ও সমাধান (১৯৬২)

মাও সে তুং-এর দেশে (১৯৬৩)

সম্মাননা

ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তাকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। ২০০৪ সালে বিবিসি জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী তালিকায় তিনি ৮ম হন।

২০১৩ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার স্কুল পাঠ্যক্রমগুলিতে তার উপস্থিতি ত্রাস করে।

(সূত্র: বাংলা উইকিপিডিয়া)

CLASSIFIED WORLD

Buy

Rent

Sell

Tools & Advice

What's New

Property Services

Blog

Help

Sign In

My Activity

Post A Property

CLASSIFIED WORLD

Your Happy Home Journey BEGINS HERE

Coming Soon...

classifiedworld.net

CLASSIFIED WORLD

NEW

BUY

RENT

PG

BUILDER

PLOTS

COMMERCIAL

AGENTS

POST AD

Enter Project, Location or Landmark

Property Type

Budget

Search

Home Loan

Mortgage

Income Tax

Credit Repair

Legal

Home Maintained

* condition apply.

A Bangla Newspaper HAKKATHA

www.hakkatha.com

Maulana Bhashani : The Majloom Jononeta

M. WAHEEDUZZAMAN MANIK



Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani was aptly called “Majloom Jononeta” (leader of the oppressed) because of his uncompromising

commitment to the needs of the poor, landless, peasants, workers, sharecroppers, abandoned, exploited and repressed people of the society. By any measure, his long political struggle was characterised by his selfless dedication for championing the causes of the most underprivileged segments of our society. Throughout almost six decades of a struggling political life, Maulana Bhashani was both a demanding spirit and a fearless voice for emancipation of the humblest, exploited, terrorised, and oppressed citizens against the overwhelming powers of the governmental machinery and the overweening grip of the ruling elite of the society. Indeed, he had to his credit an unblemished and impeccable record of life-long relentless struggle for the downtrodden, the poor, the vulnerable, the neglected, the deserted and the disinherited. Yet his dignified comportment throughout his eventful political struggle had displayed a quintessential bravery, relentlessness and dauntlessness

However, Maulana Bhashani was more than a defender of the peasantry and working class. He was responsible for building up an epoch-making resistance movement against the infamous Line system and the brutish Bangal Kheda movement in colonial Assam. He was both the maker and shaker of political events during the most turbulent years of the then East Pakistan. The seed of politics of opposition and agitation was carefully planted by Maulana Bhashani in the formative years of Pakistan in an era when the overwhelming majority of Muslim population of the then East Bengal was not yet ready to be disillusioned with the euphoria of Pakistan movement. He had played a defining role in the difficult task of building up East Pakistan Awami Muslim League, a viable opposition party in the then Pakistan. Doubtless, his was the fearless dissenting voice in the formative years of Pakistan. He was an active leader of the Bengali language movement. He was one of the chief organisers of the United Front, an electoral alliance that routed the ruling Muslim League party in the 1954 elections. He was not only the authentic founder of the East Pakistan Awami Muslim League (EPAML) but he was also the founder of the National Awami Party (NAP). Therefore, the appearance of Maulana Bhashani in the regressive political scenario of the then East Bengal as the most dauntless dissenting voice and an effective organiser of a sustainable opposition party that was capable of building-up a viable resistance movement against the Punjabi-Mohajir dominated Karachi-anchored Pakistani ruling elite was nothing short of a miracle.

It is part of Bangladesh's robust political history that it was Maulana Bhashani who had organised the historic anti-Ayub movement which took place in late 1968 and early 1969 that prompted and hastened the withdrawal of the infamous Agartala Conspiracy case and the unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman from captivity. It is widely acknowledged that he had orchestrated a

series of 'gherao' (a form of non-violent sit-in strikes designed to 'encircle' the governmental official against whom a protest was directed) immediately before and during the 1969 student-mass movement eventually led to the shameful downfall of the dictatorial regime of Ayub Khan. Maulana Bhashani's legendary name is also integral part and parcel of Bangladesh's struggle for freedom and independence.

Although Maulana Bhashani was intimately associated with all of the progressive movements during the Pakistan era from 1947 to 1971, no attempt has been made to provide any analysis or chronological details of any of those movements within the limited scope of this article. No effort has been made to discuss his fearless role in building-up the EPAML as a viable opposition political party in the then East Pakistan. Rather, the main purpose of this piece is to reflect on the formative phase of Maulana Bhashani's life and political struggle with specific reference to his struggling life up to late 1920s and early 1930s when he made Assam's Brahmaputra valley his place of residence and political struggle. However, a detailed discussion of strategies and tactics of his anti-Line system and anti-Bangal Kheda movement is not possible within the size of this paper.

Gleanings from his early life

Maulana Bhashani was born in 1885 (circa 1884) at a village named Dhangora within the jurisdiction of Sirajganj subdivision (at present Sirajganj is a district) of the then Pabna district. He was the second son of Alhaj Mohammad Sharafat Ali Khan and Mosammam Majiran Bibi. His father was neither a Zamindar nor a Talukder. Nor was he a Jotedar (intermediary between landlord and peasant) of any kind. Mohammad Sharafat Ali Khan owned a small grocery shop. He also owned a couple of acres of cultivable land. Although he was at best a middle-range farmer when Maulana Bhashani was born, his family status was quite respectable in his village by economic standards of that time. It is believed that he was a religious man who had performed Haj at an early age. According to some accounts, he performed Haj at the age of 35, and it is believed that he had walked from Mecca to Medina barefoot through the desert. The Haji title in those days added prestige not only to the performer of Haj but also added a new status to the family of a Haji.

Alhaj Mohammad Sharafat Ali Khan had named his second son Abdul Hamid Khan. However, Maulana Bhashani was known as Chega Mia during the early phase of his life. From whatever is known about his father and mother, it is plausible to suggest that his father and mother were caring parents. Unfortunately, Chega Mia lost both of his parents when he needed them most. He was hardly five or six years old when his father died at an early age in 1889 leaving behind his wife and young children (three sons and a daughter). Chega Mia (Maulana Bhashani) also lost his grandparents, mother, two brothers, and a sister in an epidemic (cholera) in mid-1890s (most probably in 1894 or in 1895) when he was barely 10 years old. Since he lost both of his parents and his grandfather at a very early phase of his life, he had to journey through a chequered boyhood. Given the fact that his father's untimely demise preceded his grandfather's death, Maulana Bhashani was clearly deprived of his inheritance right to his father's property. He was a student at a

junior madrasa for several years but he could not continue his studies due to abject poverty and changed pecuniary circumstance. As a madrasa drop-out, he had no shelter even at his paternal house due to the betrayal of his close relatives. He came to know what hunger and starvation meant as a young boy because he had neither food nor lodge even though his father left behind homestead and cultivable land. So he had started wandering around for several years, and there was no profession left in which he did not try his luck in those trying days.

The orphan son of a mid-range Muslim farmer cum petty grocer and a grandson of a humble peasant, Maulana Bhashani had little reason to anticipate, in those trying times, a dedicated and selfless life of an ardent defender of the oppressed and downtrodden people. As a young disciple of Pir Syed Nasiruddin Shah Baghdadi, he had visited and stayed in Assam in the early years of 1900s (his first visit to Assam is believed to be in 1904). Although his main task in those days was to take care of various household chores of Pir Nasiruddin Baghdadi, Maulana Bhashani had received his basic Islamic education including his skills in the rudiments of Arabic from his association with Pir Syed Nasiruddin Shah Baghdadi. At the behest of this Pir, he had also the rare opportunity to pursue more formal religious education at Deobond Madrasa for almost two years. During his stay at Deobond in 1907-09, he was deeply influenced by Maulana Mahmudul Hasan who was popularly known as 'Shaikhul Hind'. It is being conjectured by most of the biographers of Maulana Bhashani that the progressive Islamic thinkers at Deobond and the liberal traditions of Sufi Islamic preachers might have immensely inspired him to become a fearless fighter against all types of oppression and exploitation including his steep opposition to the perpetuation of British imperialism.

After his return from Deobond, most probably at the end of 1909, Maulana Bhashani started teaching in a primary school which was located at village Kagmari near Tangail town at a monthly remuneration of no more than three rupees. He also taught in a madrasa at village Kala near Haluaghat in Mymensingh district after he had quit his primary school job. Since he used to earn a monthly pittance in both of these places, his pecuniary circumstance had remained sluggish in those days. However, it is fair to suggest that wherever he went to work or live in those almost forgotten years he had demonstrated a knack for getting himself involved with the problems of the common people of that area. For instance, he used to deal with the problems of the poor, the poorest of the poor, the neglected, the hungry, the malnourished and the downtrodden. Maulana Bhashani had a strong desire for motivating and organising the marginal peasants and vulnerable villagers to resist all forms of injustices.

There is little wonder why the targets of his grass root level resistance and protest movements in those days were the Zamindars, Talukders, Jotedars, and Mahajans (money lenders). In fact, the juxtaposition of precarious conditions of the vulnerable tenants vis-à-vis the powerful landed class piqued his interest in the difficult task of defending the peasants, sharecroppers and landless agricultural laborers. If there was a conflict between a tenant (a 'Proja') and a feudal landlord, Maulana Bhashani was always on the

Maulana Bhashani : The Majloom Jononeta

Maulana Bhashani was always on the side of the tenant. He was not only an ardent defender of the tenants' rights but he was one of the most dedicated and effective organisers of the 'Proja' movement in early 1920s. (Details on the early phase of Maulana Bhashani's life can be gleaned from Chapter I of Syed Abul Maqsood's seminal work titled *Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani*, Bangla Academy, 1994, and Peter Custers' "Maulana Bhashani and the Transition to Secular Politics in East Bengal," *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XLVII (47), No. 2, April-June, 2010).

Glimpses of the formative phase of his political struggle

Given the fact that the formative phase of Maulana Bhashani's political struggle is a matter of distant past, it is difficult to ascertain the exact day or month or even the year when he got formally inducted into national or regional politics. He had developed both the compassion and organisational experience before he made his debut in national politics after joining the Indian National Congress in 1917. Although there is a paucity of authoritative details of the nature of his involvement in national politics of that time, there is no doubt that Maulana Bhashani actively participated in the Non-Cooperation and the Khilafat movement, and he was imprisoned for a brief period during that time. He was a great admirer of Ali Brothers (Maulana Mohammad Ali and Maulana Shaukat Ali) and Deshbandhu Chitta Ranjan Das. Maulana Bhashani had joined the Swarajya party with great a deal of enthusiasm being immensely impressed by Deshbandhu's charismatic and compassionate leadership style. He worked hard as a grass-root level foot soldier of the short-lived Swarajya party being essentially moved by the magnitude of personal sacrifices of C.R. Das toward achieving sustainable unity between the Hindus and Muslims in Bengal. Like C.R. Das, Maulana Bhashani sincerely believed and worked very hard for forging Hindu-Muslim unity. He was greatly saddened due to the sad and sudden death of C.R. Das on June 25, 1925.

Although Maulana Bhashani got himself involved in national politics in early 1920s, he voluntarily remained chiefly involved in the difficult task of ventilating, articulating and defending the genuine rights of the most vulnerable peasants of the regions wherever he lived in those years. In other words, he preferred to work among the peasants even though he had emerged in national politics before, during and after the Non-Cooperation and Khilafat movements. Maulana Bhashani's leadership experiences in the peasant movements in greater Mymensingh district and in other northern districts of Bengal had invariably played a role in his emergence as a charismatic peasant leader in Assam. Banned from the then greater Mymensingh district and eventually after being expelled from various northern districts of the then Bengal province, Maulana Bhashani settled in Char Bhasan (Gaghmari) of Assam in 1926 (according to some accounts, he took permanent residence in Assam in 1928).

As noted by Amalendu Guha, "After his first political experience reportedly as a Khilafatist and Non-cooperator, he (Maulana Bhashani) discovered that the real interests of the Muslim peasantry of Bengal lay in a consistent struggle against the zamindars and moneylenders, who were mostly Hindus. He did not hesitate to exploit the religious sentiment to organize and unite the oppressed Muslim peasantry, who constituted the overwhelming bulk of the Bengal peasantry. ... The itinerant Maulana, with his simple and pious habits and great organizing abilities, was accepted by the rural folk not only as a political leader but also as a Pir (saint), believed to be possessed of occult power. Hounded out of Bengal by the zamindars and the police, he settled down on the wastelands of Gaghmari, a few miles from Dhubri in Assam, and also set up another establishment in Bhashanir-char (or Bhashan char), an island in the Brahmaputra (river). Both (places) were in Goalpara district where (Bengali) settlers already

formed a fifth of the population. It was after the name of the latter place (Bhashan Char) that he was nick-named 'the Maulana of Bhashani' or simply 'Bhashani' in due course" (Amalendu Guha, "East Bengal Immigrants and Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani in Assam Politics, 1928-'47," *The Indian Economic and Social History Review*, Volume XIII, No. 4, 1976, p. 426)

Similar views about Maulana Bhashani's intimacy with the peasant movement during the formative stage of his political struggle have been expressed in a recently published article by Peter Custers, a left leaning European scholar. As emphasised by Peter Custers, "Though Bhashani originally hailed from Shirajganj in East Bengal (now Bangladesh), he derived his appellation "Bhashani" from 'char' Bhashan, a low lying area of Assam. It was here, in late (19) twenties, having been forced by the British colonial authorities to seek refuge beyond the borders of Bengal, that Bhashani cleared the jungles to build his own bamboo hut. Already by this time, the fiery theologian had distinguished himself as an opponent of the feudal zamindari system which was the backbone of Britain's rule over Bengal. The Bengal province in the 1920s had seen the emergence of a movement for tenants' rights. The 'proja' movement, protesting unjust impositions by absentee landlords, was actively supported by many rural intellectuals, including lawyers and Islamic preachers. Maulana Abdul Hamid Khan, later to be known as 'Bhashani', was not only an advocate for, but also a key organizer of this movement. In fact, he convened several big peasant gatherings before being compelled to shift his habitation to Assam. In Assam, the Maulana re-emerged as an effective and popular peasant leader, ready to champion the cause of the downtrodden" (Custers, Peter.. "Maulana Bhashani and the Transition to Secular Politics in East Bengal," *The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XLVII (47), No. 2, April-June, 2010, p. 232).

There is no doubt that Maulana Bhashani had become a legendary political figure in Assam in mid-1930s and 1940s. Yet it needs to be underscored that he had Assam connection long before he settled there in later part of 1920s. As a young disciple of Pir Syed Nasiruddin Boghdadi, as noted earlier, he had visited and stayed in Assam in the early years of 1900s. Maulana Bhashani had numerous disciples in Assam even before he permanently migrated there in late 1920s. It is believed that he was a frequent visitor to Brahmaputra valley of Assam in 1920s. He was intimately familiar with the devastating effects of the infamous Line system on the Bengali immigrant peasantry in Assam. He had first-hand knowledge about the deplorable plight of the Bengali Muslim immigrant settlers in Assam before he moved there to live. He also felt the acute need for effectively mobilising and organising the Bengali immigrant settlers throughout the Brahmaputra valley in Assam. In fact, he had realized quite early that his fight against the Line system needs to be backed up by public support and awareness, and his initial efforts were deliberately geared toward garnering such public support. For example, in 1924, Maulana Bhashani had organised a large public meeting of Bengali peasants at "Bhashan Char" (Bhashani Island) of Dubri district. The great success of this mammoth gathering of Bengali migrant settlers in Dubri area had inspired Maulana Bhashani to devote his undivided attention to the task of organising more peasant gatherings and rallies in far flung areas of vast char lands of Brahmaputra valley.

Soon after Maulana Bhashani settled in Assam, he observed that the hardworking Bengali settlers in lower districts of Assam were very vulnerable to all forms of discrimination and exploitation because they were not at all organised to protect their own legitimate rights. It was clear to him that those Bengali immigrant settlers in Assam were not in a position to build up any kind of resistance movement against the government-sponsored

discrimination and violence. Although he had never hankered after power or authority, he decided to take that responsibility upon himself to organise and develop a sustainable resistance movement of the immigrant peasants against the overweening powers of the vested interests. Maulana Bhashani's strategy at the initial stage of his struggle against the Line system was to prepare and mobilise the unorganised and vulnerable Bengali immigrant settlers in Assam. He was not willing to waste even a moment in building up a sustainable movement against the infamous Line system.

There was a total absence of any dedicated leadership committed to further the just causes of the migrant settlers in Assam even though some 'Bhadralok' Muslim leaders started showing sympathy for the Muslim immigrants. However, the seasonal or sporadic support or sympathy they had received from the Muslim leaders was at best political posturing before the general elections that were scheduled to be held in Assam in early 1937. Neither the upper class Muslim leaders nor the Bengali-speaking Hindu leaders were the trusted allies of the tormented Bengali Muslim settlers in the Brahmaputra valley. In fact, the educated middle class Bengali speaking people of Assam did not offer any form of tangible support for the legitimate grievances of the Bengali immigrant settlers in Assam. Being apparently disgusted, one Bengali scholar (Amalendu Guha) had characterised the lukewarm support of the Assamese Muslim leaders for the Bengali Muslim immigrant settlers in the Brahmaputra valley as "wordy" and "motivated." However, neither the upper class Bengali speaking Muslim leaders nor the Bengali Hindu leaders did hesitate to woo the support or sympathy from the Bengali Muslim settlers when the then Assam government made the unilateral determination in 1935 "to close down the Bengali classes" in the schools and "to encourage the setting up of new aided schools exclusively for Bengali children."

Maulana Bhashani started holding numerous community meetings throughout Assam for the purpose of forming a viable resistance movement against the vested interests. It is evident that his intent of holding public gatherings was not only to garner mass support and the public opinions in favour of the disinherited Bengali peasantry in Assam but his initial mobilising efforts in Assam were also designed to convince the vulnerable Bengali immigrant settlers, the victims of the Line system, the paramount importance of binding together in self-defense. For instance, Maulana Bhashani organised a huge 'Krishak Shommelon' (Peasants' Conference) at 'Char Bhashan' in 1929. The chief resolutions of this Conference were as follows: abolition of Line system, moratorium on the Bangal Kheda (Eviction of Bangalees) initiatives, the redress of the atrocities of Raja Probhat Kumar Barua (the Zamindar of Gouripur) over the Bengali Muslim migrants, and the introduction of uniform of weighing system throughout Assam (In fact, Maulana Bhashani's serious efforts later led to the adoption of uniform weight system in Assam).

Maulana Bhashani devoted most of his efforts from 1929 through 1935-'37 toward building up numerous organisations of Bengali immigrants throughout Brahmaputra valley. Specifically, he had formed many peasant organisations for the sole purpose of articulating their demands. He also organised the agricultural laborers and landless peasants of Assam through the formation of "Assam Chashi Majoor Samiti" in 1937. During this period, Maulana Bhashani also started holding inter-provincial peasant conferences both in Assam and Bengal districts. For instance, Maulana Bhashani had assembled the 'Bangla-Assam Proja Sommelen' (Bengal-Assam Tenants' Conference) in 1932 at Sirajgunj of the then Pabna district. One of the professed objectives of holding the inter-provincial tenants' and peasants' conference was to sensitise the people of the neighbouring Bengal about the discriminatory policies and initiatives of the Assam Government against the

Maulana Bhashani : The Majloom Jononeta

the Assam Government against the Bengali immigrant settlers in Assam. According to Amalendu Guha, "From 1928 to 1936, while still maintaining his contacts with Bengal, Bhashani used to move up and down the Brahmaputra to visit the riverside immigrant Muslim villages in accessible areas of Assam and organised them on the basis of a peasant programme including the demand for land. The colonisation of Ghagmari and Bhashanir char was due to his own personal efforts. People, suffering under the oppression of zamindars in Bengal, were in any case flocking to Assam in large numbers in order to settle on its beckoning wasteland. By 1936, Bhashani emerged as the accredited leader of the Muslim immigrants of Goalpara. He stood (contested) as a candidate in the 1937 election and returned to the Assam Legislative Assembly, formed under the Act of 1935. He (Maulana Bhashani) remained an important figure in Assam politics during the next ten years" (Amalendu Guha, "East Bengal Immigrants and Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani in Assam Politics, 1928-'47," The Indian Economic and Social History Review, Volume XIII, No. 4, 1976, p. 427).

Doubtless, the emergence of Maulana Bhashani as the ardent defender of the Bengali immigrant peasantry in Assam was spectacular. As a saviour of his fellow Bengali immigrant settlers in Assam, he had organised a viable resistance movement against both the Line system and the brutish Bangal Kheda movement in 1930s and 1940s. His was the most trusted voice during the agonising years of tears and fears of the repressed Bengali immigrant peasantry in the Brahmaputra valley of Assam. He relentlessly fought against all odds for establishing their rights in the desolated regions of Assam. Maulana Bhashani dedicated himself for a period of at least two decades for ventilating their fair grievances and articulating their legitimate demands. His defiance of the infamous Line system and his fight against the vicious 'Banglal Kheda' policies and ploys of the then Assam

Government made him a charismatic leader in Assam and a 'folk hero' in his own time. Since Maulana Bhashani was one of the tormented Bengali immigrant settlers in Assam, his resistance movement can be characterised as the bold and creative defiance and mass rejection of various anti-immigration policies and ploys of the then Assam Government.

The cherished yearning of Maulana Bhashani's early life and political struggle in the then greater Mymensingh district and in various districts of northern Bengal was to free the marginal cultivators, sharecroppers, and agricultural laborers from the yoke of the local landlords and their intermediaries and the money lenders. His struggle in the early phase of his political life both in northern districts of Bengal and the lower Assam districts can be characterised as a grassroots struggle for social justice. The emergence of Maulana Bhashani as the most charismatic peasant leader in Assam at a critical juncture was nothing short of a miracle for the discriminated and repressed Bengali peasantry in Assam. His grassroots level efforts towards building organisational infrastructures in rural regions of Bengal and Assam brought the most neglected and vulnerable segments of the society from periphery to the centre of the political spectrum.

There were a variety of voices against the infamous Line system and the brutish Bangal Kheda movement (also known as Bangal Kheda movement). There had been no dearth of criticisms of various anti-Bengali policies and ploys of the then Assam Government. Yet it was Maulana Bhashani who had emerged as the most selfless and dauntless champion of the most repressed and underprivileged Bengali peasantry in Assam. Indeed, his political struggle in Assam was deliberately designed and launched to dismantle the infamous Line system and to establish a moratorium on the Bangal Kheda

movement. His heroic defiance of the Line system and his protracted fight against the Bangal Kheda ploys of then Assam Government represented one of the most courageous and principled stands for establishing the legitimate rights of the Bengali speaking immigrants in Assam. Maulana Bhashani's homegrown, community based resistance movement against the Line system and the Bangal Kheda movement was deliberately designed by him to be a movement of the Bengali peasantry, for the Bengali peasantry, and by the Bengali peasantry in Assam.

Doubtless, Maulana Bhashani was a catalyst of the most authentic movement for accruing or establishing both civil and political rights of the Bengali immigrants in colonial Assam. His relentless fight for the salvation of the toiling masses and his uncompromising resolve to fight against all forms of discrimination, oppression, exploitation and injustices had actually rendered credible voices to the most repressed Bengali immigrants in Assam. Maulana Bhashani had imparted a heritage of simple lifestyle, selfless and untainted leadership, and uncompromising resolve to fight for social justice. As the founder of a sustainable resistance movement against the Line system and the Bangal Kheda movement, Maulana Bhashani provided a path-breaking service for the vulnerable Bengali immigrant settlers throughout Brahmaputra valley of Assam. His organised resistance movement against the brutish Line system not only had to overcome the hopelessness and fearlessness of the Bengali immigrant settlers in lower Assam districts but also had to confront the internalised psychological damage that the Government-sponsored Bangal Kheda drive had inflicted on those tormented souls.

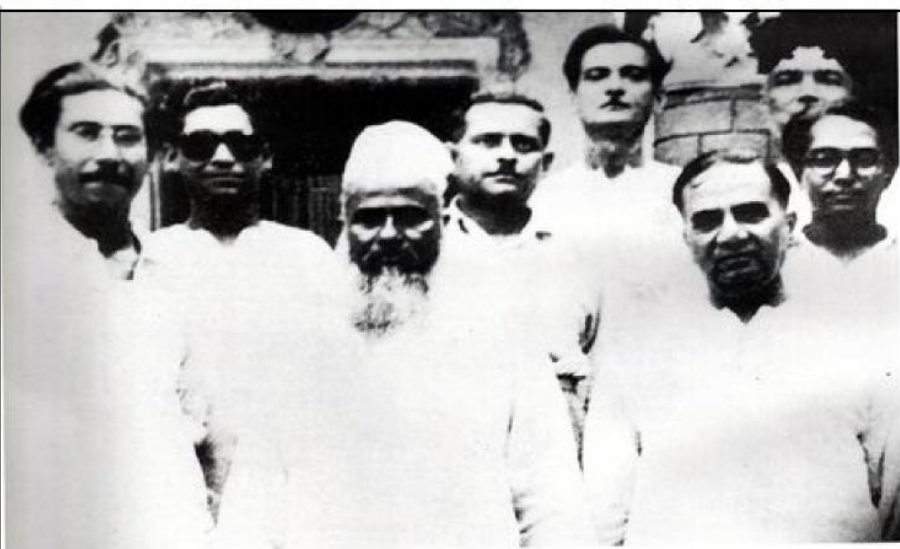
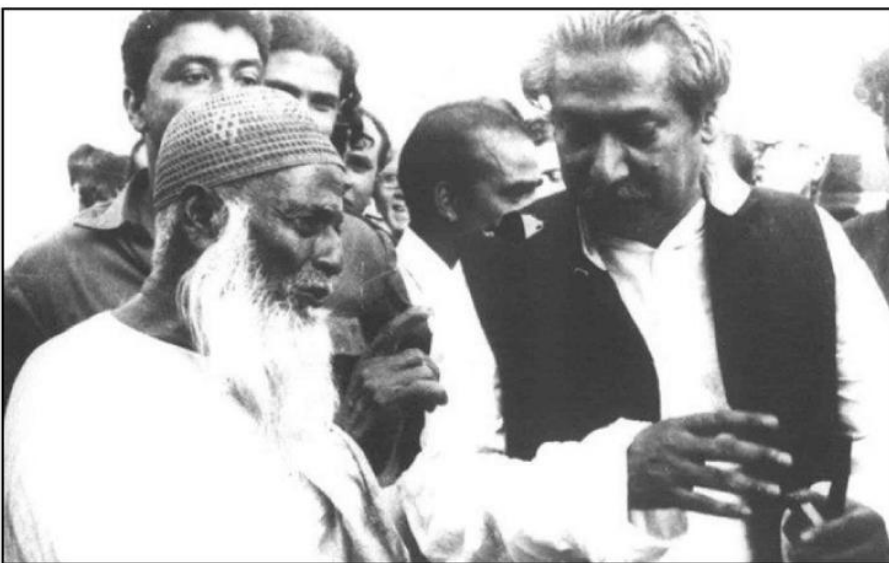
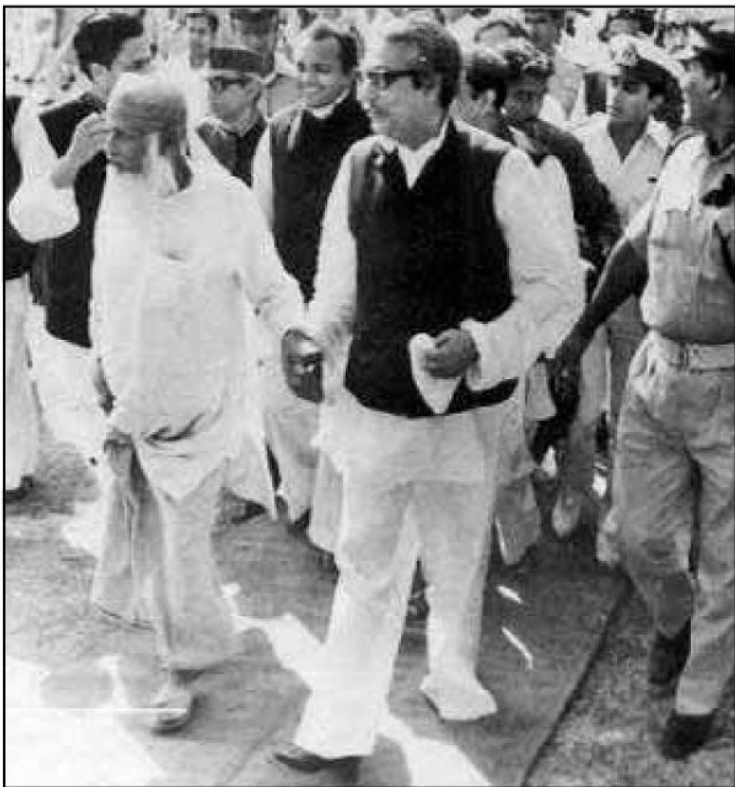
Dr. M. Waheeduzzaman (Manik) is a Professor and the Chair of the Department of Public Management and Criminal Justice at Austin Peay State University in Clarksville, Tennessee, USA and can be reached at zamanw@apsu.edu.



BONGSHAI
NEWS 24/7

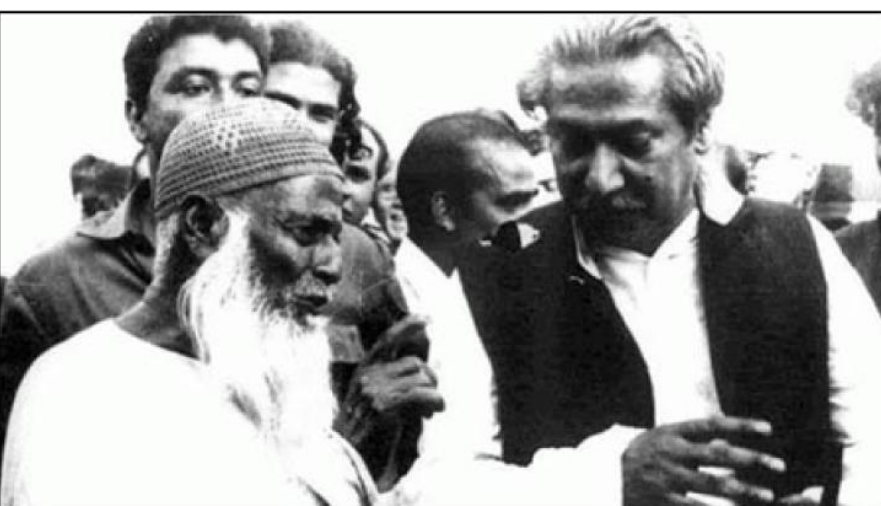
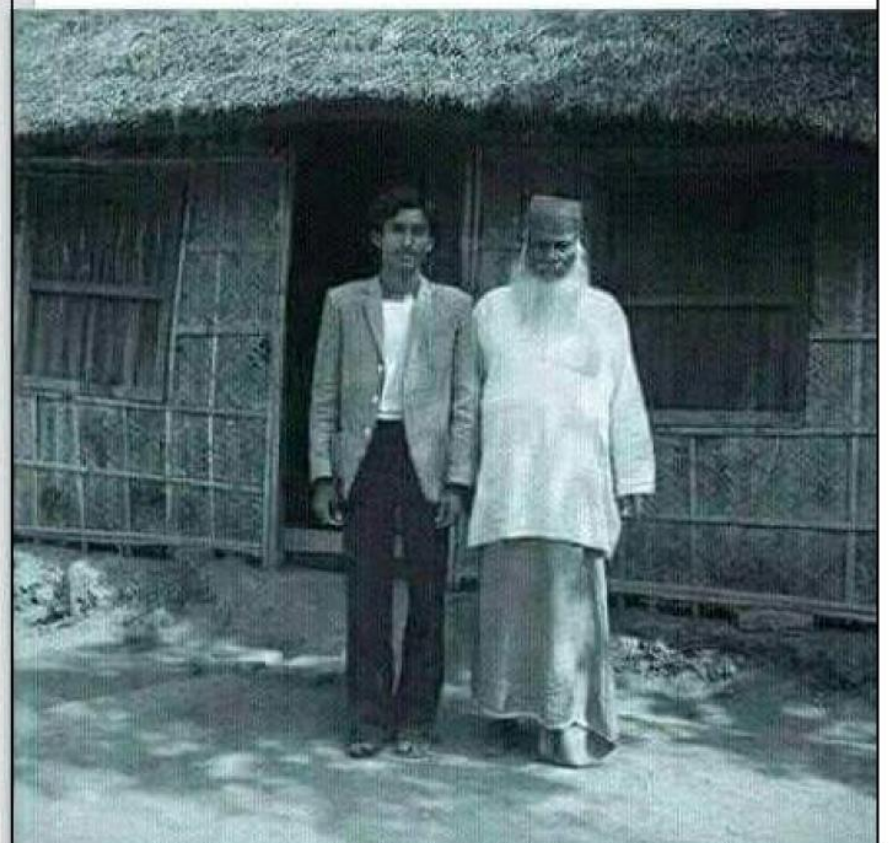
24 Hour News Based World's First Bangla Community Television Channel.

ছবিতে ভাঙ্গানী ও বঙ্গবন্ধু



ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, কাগমারী আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও তফাজ্জল হোসেন মনিক মিয়া'র সাথে
Sheikh Mujib with Maulana Bhashani, H.S. Suhrawardy and Tofazzal Hossain Manik Miah at Afro-Asian Cultural Conference, Kagmari-February 1957

মওলানা আঃ হামিদ খান ভাসানী ও যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান।





চর ভাসানের মওলানা নেই

বুলবুল খান মাহবুব

কবে কোন্ রুদ্র ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে কিষাণের পড়ো পড়ো ঘর
মহামারী বন্যায় প্রাণ দিল ক'হাজার দেহাতী মানুষ
কোন্ শস্যক্ষেতে কবে পঙ্গপাল নিয়ে আসে ভয়াল প্রতুষ
যুগ যুগ আমরা তো রাখিনি খবর।
ব্যস্ত জনপদে যারা রাজনীতি, কবিতা ও কফির ধোঁয়ায়
নির্বাচন নিয়ে মাতি, তর্ক জমে মিছিলের সার্থকতা দূর সাহারায়
অকস্মাৎ শুনি এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর
কোথায় মড়ক লাগে, পদ্মায় জল নেই, মুমূর্ষ বাংলার খবর
অজানার অন্ধকার গর্ভ থেকে জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে উঠে আসে ক্ষুদ্র প্রতিবাদ
একটি কণ্ঠ হতে লাজিত মানুষের সহস্র সংবাদ।
নতজানু স্বদেশের কানে
কি মন্ত্র দিলেন তিনি সৌম্যযোগী বৃদ্ধ ভাসানী
পল্টনে, রমনায়, টোবাটেক সিং-এ
যৌবনের স্পর্ধায় কি অসীম দুঃসাহস নিয়ে
শতাব্দীর গ্লানি ভুলে দাঁড়ালো স্বদেশ।
জীবনের জয়গানে মুখরিত বাংলা আমার।
মিছিল এগিয়ে চলে
দৃঢ় হাতে লাল ফেস্টুন
মিছিল এগিয়ে যায়
শ্লোগানে আগুন।
দাউ দাউ জ্বলে উঠে পুড়ে ছাই শতাব্দীর সনাতন গ্লানি
এ মিছিলে আগুয়ান
খেটে খাওয়া মানুষের বন্ধু ভাসানী।
ইতল বেতল ফুলের বনে, শুক্ক অশথ বটের ছায়ায়, দৃষ্টি উদাস আকাশ তলে,
শব্দবিহীন ভালোবাসায় আজকে তিনি গেলেন চলে।
ফসল ভরা মাঠের ধারে নিঃশব্দ চাষীর ঘড় পেরিয়ে
নরম কাদাবিলের পাশে পায়ে চলার পথ ছাড়িয়ে
এইযে তিনি গেলেন চলে
অন্ত পারের সে পথ ভেজা শেষ বিদায়ের অশ্রুজলে।
কালো পোশাক আচ্ছাদিত নির্মম ট্রাফিক পুলিশ
হাত উঠাতেই থেমে গেল ব্যস্ত স্বদেশ
শুধু একটি মানুষ হেঁটে চললেন ভালোবাসার ফুল কুড়াতে কুড়াতে।
শ্রদ্ধায় নতজানু পৃথিবীর অশ্রু ভেজালো পা'
শুধু তিনি হেঁটে চললেন অন্তহীন আলোর পথ ধরে
বললেন, 'তোমরা ভাল থেকে'।
শতাব্দীর ফেলে আসা গাঢ়তম অন্ধকার থেকে
প্রতিধ্বনি ফিরে এলো- ভালো থেকে
হে আমার আত্মজেরা, হায়ানার মুখোমুখি, শ্বাপদের উদ্যত থাবায়
জীবনের দৃঢ় আশ্বাসে
চিরদিন ভালো থেকে মানুষের অধিকার নিয়ে।
ভাসানের চরে হু হু হাওয়া আজ ফেরারী বাউল
কতদূর হতে বাংলায় আনে অশ্রু মেঘ
সূর্যসঙ্গ হারিয়ে পৃথিবী মৌনদ্বান
জানে রাতশেষে ফুটবে না আর একটি ফুল।
ব্যস্ত কিষাণ শুনেছো কি তোমার নেতা হারিয়ে গেছে
রুস্ত মজুর শুনেছো কি চর ভাসানের মওলানা নেই
গুমরে ওঠা বুকের ব্যথা বলবে না কেউ আর কোনদিন
বিদ্রোহী সেই কণ্ঠ যে হয় শুক্ক হল আজকে নিজেই।

একটি বটরক্ষ ও তার ছায়াতল

(মওলানা ভাসানী শ্রদ্ধাপদেয়)

তমিজ উদ্দীন লোদী

যেন জ্যোতির্ময় এক স্বর্ষির মতো আপনার অবয়ব
অঙ্গুলি হেলনে কেঁপে উঠেছিল দশদিক
একটি জমাট ছায়া যখন দানা বেঁধে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল
তখন সূর্যের মতো জ্বলে উঠেছিলেন আপনি
আপনার সেই অনবদ্য 'আসসালামু আলাইকুম'-এ দুলে উঠেছিল পূর্ব ও পশ্চিম।

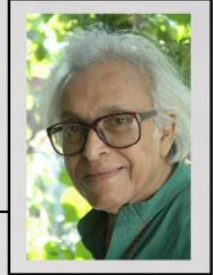
নিঃস্ব বিপন্ন মানুষেরা জানতো আপনি বরাডয়
আপনি 'লাল মওলানা' থেকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন 'মজলুম জননেতা'য়
আমাদের সমূহ গ্লানির মধ্যে আপনি ছিলেন
আশ্বাসের উৎসারিত আলো
একের পর এক জানালাগুলো খুলে যাওয়ার আনন্দ।

জেনে গিয়েছিলো বিস্তৃত মানুষেরা
ক্ষরিত জীবন ও বৈষম্যপ্রবণ রাষ্ট্রের অবয়ব
জেনেছিল অন্তর্ঘাত ও অবিশ্বাসের নানারূপ
আর জেনেছিল একটি বটরক্ষ ও তার ছায়াতল।



সফেদ পাঞ্জাবি

শামসুর রাহমান



শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খন্দ্রের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহা-প্লাবনের পর নুহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর বিচূর্ণিত দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলিময়, শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।

সবাই দেখলো চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ।
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, পড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।

বাঁকা-মুটে, ভিথিরি, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিআলা, গোয়েন্দা, কেরানি;
সমস্ত দোকানপাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকশা, ট্যাক্সি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্টোরাঁ, দস্তুর
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্জাস্কর বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী!

বল্লমের মতো বলসে ওঠে তার হাত বারবার,
অতিক্রান্ত স্কীত হয়, স্কীত হয়, মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বে-আবরু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

মওলানা ভাসানী

খান মোহাম্মদ খালেদ



মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী
জালিমের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর শাসানি।
দুনীতি-অনাচার
হলে তর্জনী তাঁর
তুলে হুঙ্কার ছেড়ে দিতেন যা তাসান-ই!
তাঁর দেয়া হুঙ্কারে
কেউ খুব পেতো নারে
জুলুমের সাহস আর পাষাণ বা পাষাণী।

জেলে-তাঁতী-চাষীদের
বস্তিরও বাসীদের
অধিকার আদায়েই রাজনীতি ছিল তাঁর--
অনগ্রায়-অবিচারে দিতেন না কোন ছাড়।

গরীবের প্রিয় সেই
নেতা আর বেঁচে নেই--
তাই যেন তাদের আর নাই কোন আসান-ই।
খামোশ-- হুঙ্কার তাঁর
দেশে খুব দরকার,
তাই ফিরে আসুক আজ মওলানা ভাসানী;
জালিমের বিরুদ্ধে দিক কড়া শাসানি।



আতিকুর রহমান মালু কবিতা

একটি খামোশ ধ্বনি

আমরা যেন কেমন নিজীব হয়ে যাচ্ছি
যুদ্ধ করা বীরের জাতি
নিজীব হয়ে যাচ্ছি
নিজীব, নিজীব,
দানব-দানবী আর
ভূত-পেত্রির ভয়ে।
শুধুই অজানা আতংকে
কাঁপে বুক দুরু-দুরু।
আরে বেঁচারাম দেউড়ীর
খেলা রামের খেলা
এখনও অনেক বাকি,
এতো সবে শুরু শুরু
মূল্যবোধের যেখানে
নেমেছে ধ্বস,
যুগ যেখানে পায় মস্তীর মদদ।
হাজার কোটি টাকা যেখানে
কোন টাকা নয়।
ছাএ-ছাএ, যুবক-যুবতী
শিক্ষক, গ্রামের সরল কৃষক,
পৌচ কিংবা বুদ্ধ
এখানে সেখানে যখন
হয়ে যায় লাশ
ঘাতকের হাতে, তারা হোক
সন্তাসী অথবা বেপরোয়া
গাড়ীর চালক।
সাগর-রুল্লীর আত্মা
শুধু কাঁদে আর কাঁদে
হানা-হানি আর
বিভাজনের অপরাধনীতি
অজগর হয়, গিলে খেতে
চায় সমগ্র দেশটাকে।
গণতন্ত্রের পরম সহিষুতা
এখন বাষ্পীভূত কর্পুর।

হায় ভাটির দেশের
বাংলাদেশে পানি নাই
ভাটিতে। সব পানি
কে নেয় টেনে উজানে?
মরু ভূমির দেশ হতে
আর কত বাকি ভাই?
অসহায় কোটি মানুষের খেদ,
ধনিক বনিকের দেহে
জমেছে কত তেল চর্বি মেদ
আমার হৃৎকার দেই
কিন্তু আওয়াজ বড় শ্রুয়মান,
অথচ একাত্তরের সুমহান মুক্তিযুদ্ধে
আমরা ছিলাম মৃত্যুঞ্জয়ী
সৈনিক, একদিন যারা
মৃত্যুকে করেছি জয়।
আমরা যেন কেমন
নিজীব হয়ে যাচ্ছি, নিজীব।
তবত বৃক্ষরাজীর পাতা
কি হরিদ্রাভ হয়?
অথচ আমরা ছিলাম
সদাই সতেজ সজীব!

তবুও আশাবাদী মন আমার
প্রতীক্ষায় আছি,
ঘনঘোর অমানিশা এবং
দুঃখ রাত্রির অবসানে
সফেত পানজাবী পড়ে, আবার
আসবেন তিনি, হলুদ শস্য
ক্ষেতের মেঠো পথ ধরে
শোষন মুক্তির গান গেয়ে
বলবেন, বজ্রনিবাদ কণ্ঠে
"খামোশ" আর সেই "খামোশ"
ধ্বনিতে কেঁপে উঠবে হিটলার
মুসলিনী, ফেরআউন ও নমরুদেও প্রেতাত্মা।
হে মজলুম মানুষের নেতা
হুজুর ভাসানী,
আরেকটিবার ফিরে এসো তুমি
বজ্রনিবাদ কণ্ঠে আবার বল
খামোশ। আমরা আরেকটিবার
শুনতে চাই তোমার সেই
খামোশ ধ্বনি,
হে হুজুর ভাসানী
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী।

একটি নাম ভাসানী

কোথা থেকে অকস্মাৎ
দুরন্ত এক অশ্বারোহী
ছুটে এসে বলে
আমি ইতিহাসের দূত, বল
কে জঁপেছিল প্রথম স্বাধীনতার নাম
তসবিহ গুনে?
আসমান ভেদ করে জনতার কণ্ঠ হয়ে
বেসে আসে একটি নাম
মওলানা ভাসানী।
বল, ভাষা আন্দোলনের
কিবা ইতিহাস জান?
অনেক ভাষা সৈনিক আসে, জানি
অনেক তার নেতা, তোমাদেরও সালাম
তবুও, বঙ্গোপসাগরের উত্তাল
তরঙ্গমালা থেকে ভেসে আসে
টাইফুনের ধ্বনি, সজোরে
প্রশ্ন করে,
বল কে করেছিল উদ্বোধন
তোমাদের এই বাংলার
শত সাধের রক্তে গড়া শহীদ মিনার?
হাজারো ফুলে সৌরভ নিয়ে
মৌমাছি গুনগুন গায় একটি নাম
মওলানা ভাসানী।

কোথায় মহমারী, দুর্ভিক্ষ,
হাঁস মুরগীর লেগেছে মড়ক,
অতি বৃষ্টিতে ভেসে গেল
সোনালী ফসল,
অনাবৃষ্টি ও খরায়
বীজধান হল সব শেষ,
কোথাও গরু চুরির উপদ্রবে
কৃষকের ঘুম হারাম হলে
বল, কে যেতেন ছুটে সবার আগে?
বল, কার ছিল কোটি কিলোয়াট
বিদ্যুৎ গতি?
একটি শুধু নাম জানি
ফরাক্কা লং মার্চের মহানায়ক
মওলানা ভাসানী।
বল, জমিদার-জোতদার-সুদখোর
মহাজন-তহশিলদারের
একি পরোয়ানার বিরুদ্ধে
পাল্টা ডিগ্রি কে করতেন জারি?
বল, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন-আমেরিকার
নির্যাতিত মানুষের কে ছিল প্রিয় বন্ধু ও নেতা
শত অন্যায্য-অবিচারের বিরুদ্ধে
কে ওড়াতেন বিদ্রোহের পতাকা?
বহু দূর থেকে পবিএ আজানের মত
ভেসে আসে একটি সুরেলা ধ্বনি
মওলানা ভাসানী।

বল দেশে গণতন্ত্র এবং
অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কে দিয়েছেন
প্রথম ছবক?
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সন্তোষ থেকে
মহীপুর, ফুলছড়ি ঘাট,
শিবপুর হাতিরদিয়া, বিনুফৈর
কাওয়াখালীর মাঠ,
পল্টন, রেসকোর্স, বীর চট্টলার
লালদিঘির ময়দান,
সব একাকার হয়
হাজারো জলপ্রপাত কথা কয়,
একটি নাম জানি
মওলানা ভাসানী।
বল, কে সে নেতা ঘরে বাইরে
বিপদে-আপদে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেনী-পেশা নির্বিশেষে
সবাইকে শোনাতে অভয়বাণী, শোনাতে
শোষণ মুক্তির গান-
জীবনের জয়গান,
একটি নাম জানি
মওলানা ভাসানী।
এইতো ছিলেন
এইতো গেলেন
এই ছিলেন

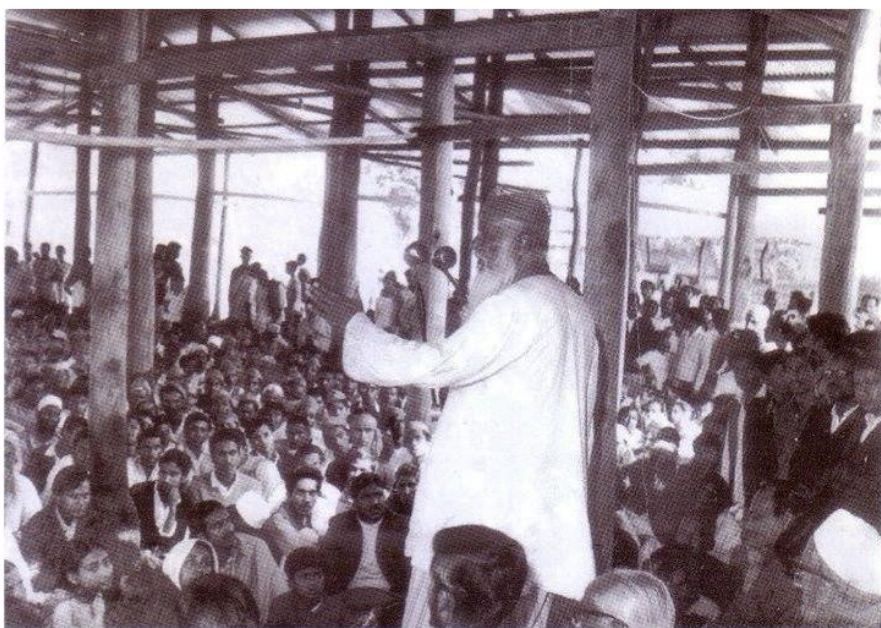


এই গেলেন,
দুস্ত পদে হেঁটে গেলেন তিনি
নগ্ন জনপদে কৃষকের পল্লীতে
শীতের শিশির কণা আর
হলুদ শস্যফুলের রেণু মেখে গায়
বাংলার মেঠোপথ ধরে
হায় থেমে গেল বজ্রনিবাদ
সেই ঐতিহাসিক খামোশ ধ্বনি
মহা সমুদ্রের গর্জন, এক নিমিষেই।
এই ছিলেন, এই গেলেন
এইতো ছিলেন, এইতো গেলেন
কৃষক শ্রমিকের নয়নের মণি
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী।

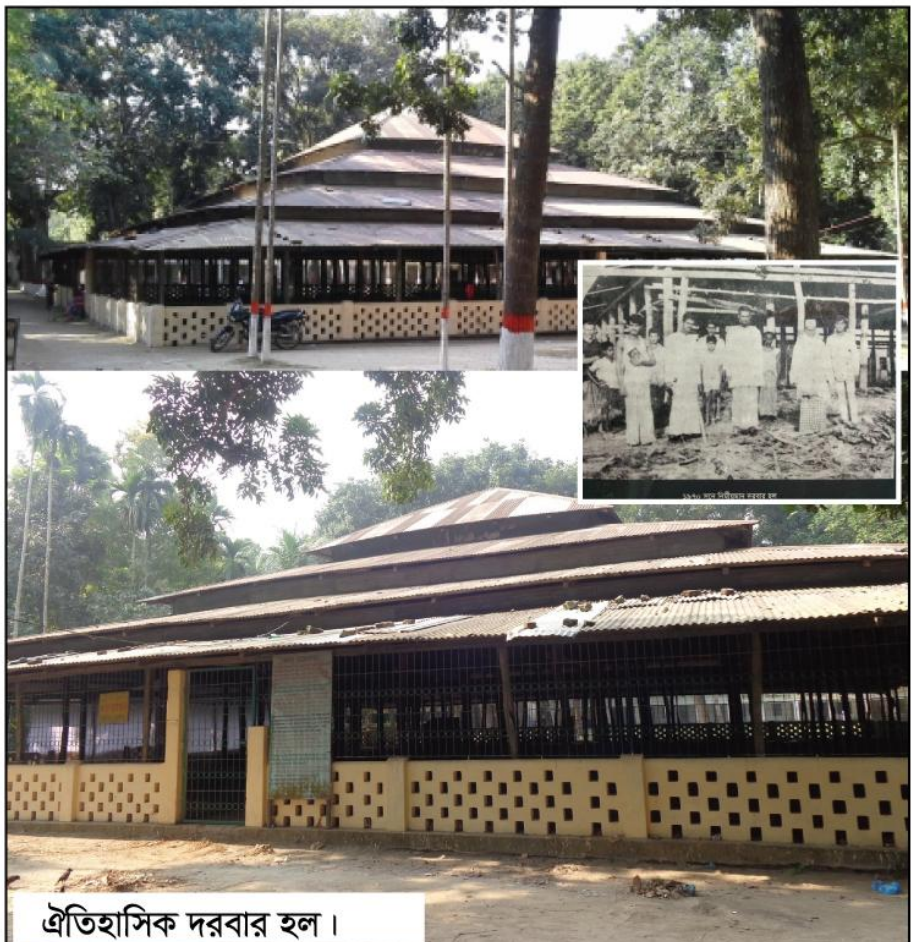
সংবাদ পড়তে ক্লিক করুন-

আজকের
টেলিগ্রাম
www.ajkertelegram.net

স্মৃতি বিজরীত সন্তোষের স্থাপনা



১৯৭০ সালের ১৯ জানুয়ারি সন্তোষে 'লাল টুপি' সম্মেলনে



ঐতিহাসিক দরবার হল।



একাত্তরিক ট্রাক্টর ১৯৬৭ সনে
মহাট্মার মহান নেতা মাওলানা
মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীকে
উপঢৌকন হিসাবে দান করেন।

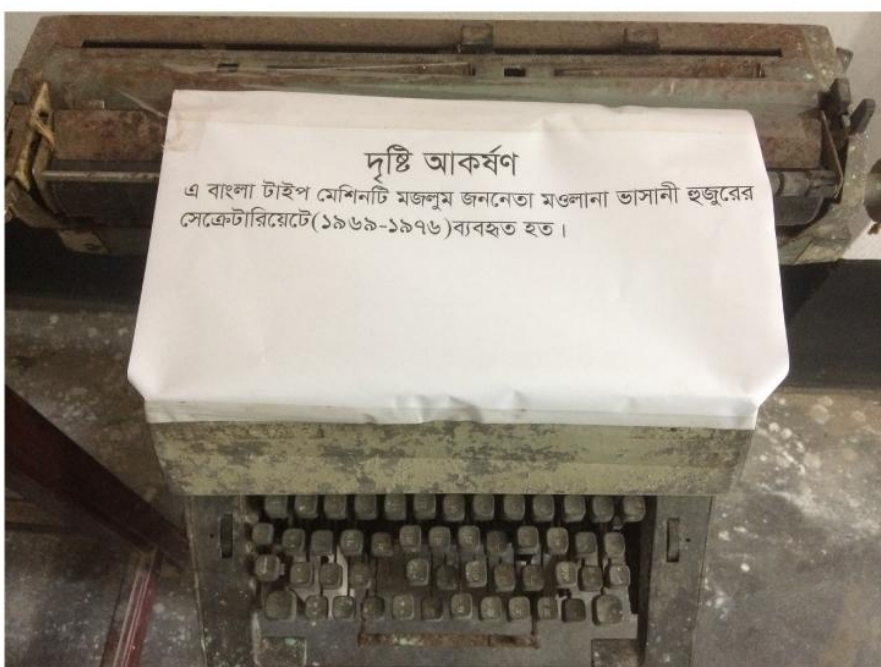


১৯৬৩ সনে মাওলানা ভাসানীর
মহাট্মার সফরকালে প্রধান যন্ত্রী
চৌ এন লাই প্রদত্ত ট্রানজিস্টার।

মাওলানা ভাসানী যে ধরনের
টুপি ব্যবহার করতেন—
(তালের আঁশ দিয়ে তৈরী)



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক



দৃষ্টি আকর্ষণ
এ বাংলা টাইপ মেশিনটি মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী হুজুরের
সেক্রেটারিয়েটে (১৯৬৯-১৯৭৬) ব্যবহৃত হত।



দিঘী

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

‘নদী চর খাল বিল গজারীর বন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন’

‘যুগ যুগ জিও হুমি’



‘মওলানা ভাসানী’

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, আমাদের গর্ব

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী’র ৪৪তম ওফাত বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের পক্ষ থেকে রইল



মো: রফিকুল ইসলাম

সভাপতি

গভীর শ্রদ্ধা



মোঃ মেলিম খান

সাধারণ সম্পাদক

❖ সহ সভাপতি- মো: আশরাফ ভূঁইয়া (টনি), অহিদুল ইসলাম আলম (বাবু) ও সাগর সেন ❖ সহ সাধারণ সম্পাদক- মো: সোহেল রানা রিপন ❖ কোষাধ্যক্ষ- মো: আল আমীন ❖ সাংগঠনিক সম্পাদক- মো: ইসমাইল হোসেন ❖ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- খন্দকার মনিরুজ্জামান আরীফ ❖ প্রচার সম্পাদক- মো: কামরুল ইসলাম ❖ সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মো: হুমায়ুন হোসাইন ❖ ক্রীড়া সম্পাদক- মো: ওসমান গণি ❖ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- জহিদা আলম ❖ অফিস সম্পাদক- মো: ফারুক হোসেন। ❖ কার্যকরী সদস্য: মো: কাউসার আহমেদ মন্টু, মো: সোলায়মান খান, সোমা সাঈদ, মো: মোকাদ্দেস আলী, মো: আব্দুস সালাম, মো: শামসুজ্জামান খান, মো: আশরাফ আলম জঙ্গী, মো: হারুন অর রশীদ (বাবলু), মো: মিজানুর রহমান খান আপেল, মো: দেওয়ান আমিনুর রহমান, মো: খন্দকার মাহবুব হোসাইন, মো: মির্জা নূর-এ আলম, মো: তারিকুল ইসলাম, মো: ইউনুস আলী, মোহাম্মদ আলী, মো: শহিদুল ইসলাম শহিদ, মো: হাসান আলী, মো: আজাদ আলী খান, মো: আব্দুর রাজ্জাক, মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রতাপ দে, সৈয়দ ইমরুল আলম (শাহেদ), মো: হারুন অর রশীদ, মো: বেলায়েত হোসেন, মো: বেলায়েত হোসেন (২), এম এ নাসির, মো: জহিরুল ইসলাম, খন্দকার আলতাফ হোসেন ও গোপন সাহা।

টাঙ্গাইল মোসাহিটি ইউএসএ ইনক

প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়

হক কথা রিপোর্ট

প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়। অনেক হয়েছে, আর নয়। দেশের 'ভিলেজ পলিটিক্স' থেকে শুরু করে ন্যাশনাল পলিটিক্স পর্যন্ত কোন পলিটিক্সই বাদ নেই। এই প্রবাসে আমাদেও বাংলাদেশী কমিউনিটিতে। আর এই পলিটিক্স করতে গিয়ে একের পর এক ঘটে চলেছে অপকর্ম, অঘটন। এসব অপকর্ম-অঘটন থেকে বাদ পরেনি দেশের জাতীয় নেতৃত্বদেও সামনেই হাতাহাতি,

হক কথা

A Bangla Newspaper HAKKATHA

প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়

সাপ্তাহিক হক কথা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (২০০৬ সাল)



হচ্ছে কি? আত্মবাজ, রাজনীতি সচেতন বাংলাদেশীরা এইবিদেশ-বিভূইয়ে এসেও দেশের রাজনীতি করে চলেছেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাসদ, গণ ফোরাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নামে প্রবাসে রাজনীতি হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের নামেও এই প্রবাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর রাজনীতিও চলছে। (পৃ: ১৩ দেখুন)

মারামারি। পাশাপাশি বুদ্ধি পেয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে নানা প্রকার ঝিধা-ঝন্ড, ব্যক্তিগত আক্রোশ, শত্রুতা, বিদ্বেষ, সময় ক্ষেপণ আর অর্থের অপচয়। প্রশ্ন উঠেছে প্রবাসে দেশের রাজনীতি করে লাভটা

জাতীয় পার্টি, জাসদ, গণ ফোরাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নামে প্রবাসে রাজনীতি হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের নামেও এই প্রবাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর রাজনীতিও চলছে। (পৃ: ১৩ দেখুন)

The New York Times/ Nov. 18, 1976

Abdul Bhashani, Bengali Leader And Moslem Guru, Is Dead at 97

DACCA, Bangladesh, Nov. 17 (Reuters) —Abdul Hamid Bhashani, a Bengali politician and Moslem leader, died in Dacca's Medical College Hospital tonight. He was believed to be 97 years old. He was admitted to the hospital three weeks ago with a heart condition and acute bronchitis. To millions of Bengali peasants, Abdul Hamid Bhashani was a Moslem maulana or guru, and with his face



fringed by a wealth of white beard and reflecting an almost otherworldly serenity he looked the part. Nevertheless, he was Pakistan's most outspoken advocate of

violence in the days before East Pakistan became Bangladesh. As head of the left?wing, pro?Peking faction of the National Awami Party, Mr. Bhashani was a bitter opponent of India, which he had furiously attacked as "the greatest enemy of Bengali Moslems." Many of his supporters were Communists who took their ideology from Mao Tse?tung. The Maulana, who some years ago said he had (Page 13 See)



নিউইয়র্ক : সাপ্তাহিক হক কথা কার্যালয়ে আলাপত বাংলাদেশের স্বনামধন্য সাংবাদিক, ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি (মরহুম) ফাজলে রশীদ ও বিশিষ্ট কলামিস্ট-সাংবাদিক, দৈনিক ইনকিলাব-এর সহকারী সম্পাদক মোবায়দুর রহমান। পাশে হক কথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ। তার কোলে ভতিজা তাহমিদ রহমান। ছবিটি ২০০৬ সালে তোলা।

‘হক কথা ও ইউএনএ’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১ জানুয়ারী

হক কথা রিপোর্ট

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ‘হক কথা’ ও নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলাদেশী বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১ জানুয়ারী। বিগত ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে হক কথা প্রকাশনা শুরু ও ইউএনএ’র নিউজ সার্ভিস চালু করা হয়। বাংলাদেশের স্বপ্নদৃষ্টি, আফ্রো-এশিয়া ল্যান্ডের আমেরিকার মজলুম মানুষের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ‘নীতি-আদর্শ’ অনুসরণ করেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা’র নামেই ‘হক কথা’ আত্মপ্রকাশ করে। ‘হক কথা’ শুরু থেকেই সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রকাশিত হতো। ‘হক কথা’র মূল্য ছিলো মাত্র ৫০ সেন্ট। এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন মরহুম মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান আর সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ। অপরদিকে নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটি ও আমেরিকার খবরাখবর পাঠকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ‘ইউএনএ’ তার নিউজ সার্ভিস চালু করে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী মিডিয়া ছাড়াও

বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় ‘ইউএনএ’ তার সার্ভিস অব্যাহত রেখে চলেছে এবং কমিউনিটির একটি বিশুদ্ধ ‘নিউজ এজেন্সী’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, হক কথা নিয়মিত এক বছর প্রকাশনার পর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পত্রিকাটি বন্ধ রাখা হয় এবং পরবর্তীতে হক কথা প্রিন্টের পরিবর্তে ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর নিয়মিত প্রকাশিত এবং আপগ্রেড করা হচ্ছে। ‘হক কথা’র প্রথম সংখ্যার প্রথম শিরোনাম ছিলো ‘প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়’। হক কথা পড়তে চাইলে লগ ইন করুন: যথশ্রদ্ধাযত্নে পড়ুন নিউইয়র্ক থেকে ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী প্রকাশিত হক কথা’র সূচনা সংখ্যায় (প্রথম সংখ্যা) ‘আমাদের কথা’ শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়’র সাথে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ছবিও প্রকাশ করা হয়। হক কথা’র পাঠকদের জন্য প্রথম সম্পাদকীয়টি ছব্বছ তুলে ধরা হলো। সম্পাদকীয় : আমাদের কথা ‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এক (পৃষ্ঠা ১৩ দেখুন)

মওলানা ভাসানীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ১৭ নভেম্বর ২০২০

মওলানা ভাসানী জীবন ও দর্শন

LIVE

মুখ্য অতিথি : সৈয়দ আব্দুল মকসুদ লেখক, দার্শনিক, সমালোচক, কলামিস্ট

অতিথি : সৈয়দ তিখু সুলাহান সোনিডেস, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন

অতিথি : রহমান সাদু প্রধান উপদেষ্টা, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন

ড. জগদীপ উদ্দিন আহমেদ সাবেক ডিপি, জাতীয়তাবাদী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মাহবুব উল্লাহ লেখক ও কলামিস্ট

মুখ্য কবির সম্পাদক, ডিই এজ

মাস্টারমিন নাসের সহ-সম্পাদক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন

মোঃ আলী ইমাম সাধারণ সম্পাদক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন

রিতা রহমান উপদেষ্টা, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন

কাজী জাহিদুল ইসলাম লেখক, কলামিস্ট

বাংলাদেশ সময় ১১টা

হাজী তাহির আলী ফাউন্ডেশন

মানবতার সেবায় আমরা

ফাতেমা ব্রাদার্স গ্রুপ

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশসহ সাউথ এশিয়ান পণ্যসামগ্রীর সর্ববৃহৎ আমদানিকারক

SHAFI CHOWDHURY

Tax Travel Accounting Immigration Consultant

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Travel, Payroll & Immigration

167-13 Hillside Ave 2A, Jamaica NY 11432

Cell : 646-403-6500, Fax : 917-775-7357

e-mail : hillsideaccounting@gmail.com

169 St Station (Al Hamrah 2nd Fl)

ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা

UNA

UNITED NEWS OF AMERICA

আপনার খবরের সর্বোচ্চ প্রচারে যোগাযোগ করুন-

Contact : +1 347-848-3834

২৪ ঘণ্টা বাংলা গান

Radio goongoon

radiogoongoon.com

আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে মুহূর্তেই শোঁছে যাবে আপনার প্রিয়জনদের

২৪ ঘণ্টা ঘরে বসে টাকা সাঠান

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে

বাংলাদেশে টাকা সাঠান কোন ধরনের চি ছাড়া

তাকাশ একাউন্টে

SENDWAVE

WELCOME তাকাত

SIGN UP TODAY GET \$5 CREDIT

SEND MONEY WITH LOVE

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Editor : ABM Salahuddin Ahmed, Ass. Editor : Samiul Islam. Mailing Address : 87-50 Kingston Pl, Apt #5H, Jamaica, NY 11432, USA. Contact : +1 347-848-3834, E-mail : hakkathany@gmail.com, Published by WEEKLY HAKKATHA Inc.